বুকঝিম এক ভালোবাসা

সৈয়দ শামসুল হক

বিদ্যাবতী, রইলা কতদূর?

লোকসকল, একালের শর্করা-স্বপ্নলেখা সরল সকল আখ্যান থেকে অনেক দূরে ও গভীরে আপনাদের আমি এখন ডাকি।

এখন আমি সেই বিদ্যাবতীকে ডাকি যখন তিনি ছিলেন ভারত-সম্রাট আকবর শাহার কালে। বাদশাহর বাদশাহি গেছে, সময় তো থেমে থাকেনি।

একালে আমি সেই সেকালের বিদ্যাবতীকে ডাকি যিনি দিয়েছিলেন আমাদেরই বাংলাদেশের ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা আরো কত ছোটবড় নদ-নদীর তীরে বয়াতির কণ্ঠে মানুষের কথাসকলের গাথা-গান।

লোকসকল, আজ সেই একটি গান।

আজ সেই ভালোবাসার একটি কথা।

লোকসকল, আমাকে অনুমতি করুন, আপনাদের নিয়ে যাই তবে আজ থেকে পাঁচশ' বছর আগে, ব্রহ্মপুত্র তীরে।

তেরোশত নদীমাতা এই পলিমাটির দেশে আমাদের একালের কথাকার আর নাট্যকারদের পূর্বপুরুষ মনসুর বয়াতির জীবনের কথা আমি কত খুঁজেছি। কত দীর্ঘদিন আমি পালাগানের পাতায় পাতায়, মনসুর বয়াতির ইতিহাস সন্ধান করেছি। কিছুই তো পাইনি আমি কোনে গানে, গাথায়, কী পালায়। শুধু এইটুকু আবিষ্কার করি যে, আমাদের প্রত্যেকের অন্তর্গত বুকঝিম এক ভালোবাসার ভেতরে আছে এই মানুষটির নিঃশ্বাস। লেখায় তিনি আমার অগ্রজ, ভালোবাসায় তিনি আমার প্রেম-কাঠামো।

পূর্ববাংলার যাবৎ পালা ও গাথা থেকে ঘটনার শতসূত্র নিয়ে, সেই সকল পালাকার গাথাকারের শত সঙ্গীত থেকে শব্দ ঋণ করে পদ বেঁধে, আমি এখন রচনা করি মনসুর বয়াতির জীবনকথা, তাঁর প্রেমজীবনের কথা, এক জীবন-বৃক্ষের তুল্য তাঁর অমর প্রেমগাথা।

লোকসকল, আমাকে অনুমতি করুন।

আমি মনসুর বয়াতির কথা বলি।

প্রেমের নদী উজান বইয়া যায়।

জমিদার ফিরোজ দেওয়ানের সাতমহলা বাড়ি। বিবি চাঁদ সুলতানার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু এক রাতের জন্যেও এক শয্যায় তাঁরা ছিলেন না। বিবি চাঁদ আজ আর নেই।

কেন নেই?

কেন আজও ফিরোজ দেওয়ানের সাতমহলা শূন্যতার হাহাকারে কাঁদে, কাঁদেন যে ফিরোজ দেওয়ান, সে-কথা আমি বলব, লোকসকল।

বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে যায় ব্রহ্মপুত্র নদ। তার জলে আষাঢ়ের পাহাড়-পাগল ঢেউ। তারও চেয়ে বড় ঢেউ ফিরোজ দেওয়ানের মনে। সাতমহলা বাড়ির বাহির অঙ্গনে বসে আছে আবুল, মনসুর বয়াতির শিষ্য, যে মনসুর বয়াতির লাশ ভেসে গেছে ব্রহ্মপুত্রের জলে।

তার চুলে শরতের শাদা মেঘ চুল, হাতে তার মনসুর বয়াতির সারিন্দা। সেই সারিন্দা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বুকের কাছে ধরে বসে আছে আবুল।

ফিরোজ দেওয়ান এসে দাঁড়ান বয়াতির সমুখে। হাজারো সালাম করে উঠে দাঁড়ায় আবুল বয়াতি।

সালাম হুজুর, আপনার চরণে হাজার হাজার সালাম। হুজুরের কাছে কাল করে গেলাম গান। আজ আবারো তলব পেয়ে হাজির হলাম। কী হুকুম, কন?

সেবাদাসেরা সিংহাসন এনে রাখে।

গাছের কুসুমেরা দুলে ওঠে।

কুসুমও অন্তর ধরে মানুষেরই মতো।

ফিরোজ দেওয়ান বলে, বয়াতি, তোমাকে আমি খবর দিয়ে এনেছি। তুমি আবার সেই গান কর।

বয়াতি অবাক হয়ে নিবেদন করে, আবার সেই গান?

এ গান গাইতে বয়াতির বুক আষাঢ়ের মেঘের মতো ঘন দল হয়ে ওঠে, মানুষের বুকে বর্ষা থমথম করে।

সিংহাসনে বসতে বসতে বৃদ্ধ দেওয়ান বলেন, তুমি সেই গান কর, আবার সেই গান। সেই যে তারা ভালোবেসেছিল, সেই যে তারা অন্তরে কত দুঃখ পেয়েছিল, সেই যে তারা এক দেহ এক প্রাণ হয়ে গিয়েছিল, সে কবেকার কথা, মনে হয় এখনকারই কথা, তুমি তাদের গান কর। সেই গান আবার তুমি আমাকে শোনাও। সেই গান তুমি জগৎবাসীকে শোনাও। তোমার সারিন্দা হাতে নাও বয়াতি। ধর, গান ধর।

বুকের ভেতরে আষাঢ়ের মেঘ নামে ঘন বর্ষণে।

সারিন্দাটা কপালে ছোঁয়ায় বয়াতি।

খলখল করে ওঠে ব্রহ্মপুত্রের জল। ধায়, তারা দক্ষিণের দিকে ধায়।

‘আ, এই পানি যায়, ভেসে যায়, দূরে যায়, দরিয়ায়।
সৃষ্টির আদি হতে যায় বহে, বহে যায়।
পানি, এই পানি কি গাঙের পানি? ও কি চক্ষেরও পানি?
কার কমল চক্ষের পানি এই গাঙের পানি?
আ, এই পানি যায়, ভেসে যায়, দু’টি ফুল দেখা যায়।’

পদ্মফুলের জোড়া, তবে ফুল নয় দুটি হৃদয়।

পদ্ম, এই পদ্ম, এ যে হৃদয় পদ্ম। ও কি প্রেমের পদ্ম হয়?

কারো সবুজ আর অবুঝ মনের এই যুগল পদ্ম, যার গান আমি করি।

‘আ, এই পানি যায়,
ভেসে যায়, আহা যায়, নিয়ে যায় একখানা বাঁশি।
আর নাই, সুর নাই, বাঁশি, এই বাঁশি।’

ও কি মোহন কোনো বাঁশি? ও কি বন্ধুর বাঁশি তবে? কারো প্রাণের আকুলতায় একদিন বেজেছিল এই বাঁশি?

‘আ, এই পানি যায়, ভেসে যায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বহে যায় দরিয়ায়
পদ্ম আর বাঁশি।'

ছেঁড়া পদ্ম আর ভাঙা বাঁশি। বাঁশির সুরেই কি পদ্মের জন্ম হয়? একজোড়া পদ্ম তবে ভেসে যায় দরিয়ায়। এক বুকঝিম করা ভালোবাসা নিয়ে পানি বহে যায়, দরিয়ায়। দরিয়ায় সবকিছু ডুবে যায়, মানুষের মনে কিন্তু কিছুই ডোবে না। সব ভেসে রয়।

ফিরোজ দেওয়ান দু চোখ বন্ধ করে বসে আছেন সিংহাসনে। ঘুমে কি জাগরণে, কে বলবে?

চোখ খুললেই কি আর জগৎ দেখা যায়? চোখ বন্ধ করলেই কি দেখা যায় অতীত? লোকসকল, আমার নাম আবুল হোসেন বয়াতি। আমার ওস্তাদ ছিল মনসুর বয়াতি। এ কাহিনী মনসুর বয়াতির কাহিনী। তার ভালোবাসার কাহিনী। এক বড় ভাই ছাড়া দুনিয়ায় তার কেউ ছিল না। বুকভরা মায়া নিয়ে তার বড়ভাই নিজের ছেলের মতো নিজ হাতে মানুষ করেছিল তাকে। বড় ভাই মাটির বুকে লাঙল দিয়ে মাটি চাষ করে শস্য ফলায়। আর ছোট ভাই সারিন্দার তারে সৃষ্টি করে সুর। মানুষের সমাজে, মানুষের মনে, মানুষের নিয়মের ভেতরে, চিন্তার ভেতরে, হায়রে, কতশত দরোজা। মনসুর বয়াতির গান সেই সকল দরোজা খুলে দেয়।

লোকসকল, তবে এই কাহিনীর শুরু হয় এভাবে। একদিন তার সেই গান, আমার ওস্তাদ মনুসর বয়াতির গান, আমি তখন নাবালক শিষ্য তার, সেই গান দেওয়ান মহব্বত জঙ্গের ভগ্নি বিবি চাঁদ সুলতানার মনের কবাট খুলে দেয়। গরিব আর বড়লোকের ভালোবাসা কি এই জগতে হয়?

লোকসকল, চাঁদবিবি আর মনসুরের এই কাহিনী শুনে বনের পশু হিংসা ভুলে যায়—মানুষও তো বনের পশুই হয়ে যায় কখনো কখনো। মনসুর বয়াতির এই কাহিনী শুনে গাছের পাতা পড়ে চোখের পানির মতো টুপটুপ করে। আর, আকাশের পাখি নীল আকাশে চক্কর দেয়, আর ডাকে, ডাকে তার সঙ্গের সাথীকে, কিন্তু কোথাও কি পায়?

মনসুর বয়াতির কাহিনী তবে নিবেদন করি। সে ছিল গানের পাগল। অন্যলোকে আহার করে, সারিন্দার সুর ছাড়া তার অন্য আহার নাই। দুনিয়ার দশজনে দশ কাম করে, বাদশাই থেকে কৃষিকাজ। কিন্তু কিছুই তার মনে ধরে না।

কোন বিধাতা সৃজিল সারিন্দারে?

গ্রামের প্রান্তে বটগাছ। প্রান্তর পুড়ে যাচ্ছে কঠিন নির্দয় রোদে। গাছের নিচে মায়ের মতো ছায়া। সেই ছায়া-মায়ের কোলে বসে মনসুর বয়াতি আর আবুল।

আবুল রে, আজ সকালে নতুন এক গান বেঁধেছি। মিয়াভাইয়ের শতেক গঞ্জনা শুনি আর হাসি আমি। হাসিটাই কি সব রে, আবুল? একেক সময় আমার মনের মধ্যে জিজ্ঞাসা জাগে। আচ্ছা তুই ক' তো দেখি—আমি কেন আর সকলের মতো হইলাম না?

সারিন্দার তারে সৃষ্টির আঘাত করে গেয়ে ওঠে মনসুর।

'আমি ভেবে পাইলাম না রে আমি, আমি ভেবে পাইলাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমি কেন আর সকলের মতো হইলাম না?'

তার সারিন্দার সুরের টানেই বা, হাটের দিকে পথ চলতে চলতে এক ফিরিওয়ালা এসে বটের তলায় ক্ষণেকের জন্যে দাঁড়ায়। মাথায় চুবড়ি। নারীদের মনভোলানো কত সওদা সেই চুবড়িতে। চুড়ি, রঙিন ফিতে, নকল সোনার হার, আয়না, মুখ মাজনের চন্দন-গুঁড়ো। দাঁড়াবার সময় কি আছে তার? বেলা হয়ে যাচ্ছে না? হাট বসে গেছে গাঁয়ের ওই শেষপ্রান্তে খালের পাড়ে।

মনসুরের সঙ্গে থেকে থেকে আবুলেরও এখন গান বাঁধার বিদ্যে কিছু রপ্ত হয়েছে। চারদিকে যা দেখে সেখান থেকেই বিষয় আসে, উপমা আসে, তুলনা আসে, সত্যের একটা চেহারা আসে—এরি মধ্যে জানা হয়ে গেছে আবুলের। ফিরিওয়ালার দিকে মৃদু হেসে সুরে সুরে, মুখে মুখে, পদ রচনা করে আবুল।

'হারে, ওস্তাদ, তোমারে করি সালাম। কিন্তু কও দেখি,
তুমি কেন বেচারামের মতো হইলা না?'

বেচারাম? মনসুর প্রশ্ন করে শিষ্যকে।

ওই যে দ্যাখো বেচারাম। চলেছে হাটের দিকে।

'তুমি কেন বেচারামের মতো হইলা না?
তার নাই পুঁজিপাটা,
আছে এক আয়না ফাটা,
বেচারাম বেটার বেটা,
বেচবে হাটে কেমনে দ্যাখো না?'

হা হা করে হেসে ওঠে মনসুর। বলে, ঠিক, ঠিক। নারীর মন ভোলাতে এই বেচারামের অধিক দড় আর কে আছে? কিন্তু শোন রে আবুল, বেচারামের ওপিঠেই আছে কেনারাম। সেই কেনারামের কথা। আমি তো কেনারামও হতে পারতাম। নাকি? এত বলে মনসুর বয়াতি সারিন্দায় দেয় টান। গেয়ে ওঠে—

'আমি কেন কেনারামের মতো হইলাম না?
পিরীতি করল যারে
কেনারাম কিনল তারে
দিয়ে তারে সোনা নয়, সোনা নয়, মনের সোনার গহনা।'

ফিরিওয়ালা বলে, হাটের বেলা যায়, মনসুর ভাই। নইলে মন বলে, সারাদিন বসে তোমার গলার গান শুনি।

মনসুর বলে, চলবে আবুল, ছায়া ছেড়ে রোদ্দুরে যাই। এই না রোদ্দুর দেয় জীবন। মায়ের আঁচলের মতো ছায়া যে ছায়া, সেই ছায়া ত্যাগ করে ঝাঁপ দেব জীবনে।

এক যুবতী যায় হাটের দিকে, তার পেছনে যুবক, সে যুবক তার সঙ্গ ছাড়ে না। যুবতী রোষ করে তাকায়। যুবক দাঁড়ায় থমকে। আবার পথ চলে যুবতী। আবার যুবক তাকে অনুসরণ করে।

এই ছবিটির দিকে আবুল মনসুরের হাত ধরে বলে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

‘হারে ওস্তাদ, তোমারে সালাম করি। কিন্তু কও দেখি,
তুমি কেন সুধারামের মতো হইলা না?
ওই দ্যাখো যুবক যুবতী। যুবতীর ঘ্রাণে টানে যুবকের মন।
তুমি কেন সুধারামের মতো হইলা না?
ডালেতে ফুল ফুটেছে
সুধারাম ওই জুটেছে
মধু সে পান করেছে,
এই মধুর স্বাদও এই জীবনে তুমি পাইলা না।’

মনসুরের মুখ হয়ে ওঠে বিষাদিত। রোদ্দুর করে ঝিমঝিম। মায়ের আঁচল ডাকে—আয়, আয়। মনসুর গায়,

‘আমি কেন বোকারামের মতো হইলাম না?
পারিলাম না কিনিতে,
জানিলাম না বেচিতে,
বাঁচিলাম না সুধাতে,
খালি হাতে পড়ে রইলাম রে।
আমি খালি হাতে, খালি হাতে, খালি হাতে
পড়ে রইলাম রে।’

লোকসকল, এই সময়ে মনসুর বয়াতির কানে পড়ে টান। সারিন্দার সুরে আর পদ রচনার ঘোরে জগৎ গিয়েছিল ভুলে। জগতের দিকে ফেরায় তাকে হায়দার, মনসুরের মিয়াভাই, সেই যে ভাই তাকে বাপের আদরে মানুষ করেছে।

আরে, মিয়াভাই?

মিয়াভাই না। তোমার আজরাইল।

আবুল তখন মনসুরের সারিন্দাটা বুকের পরে চেপে ভোঁ দৌড়ে প্রান্তরের শেষ মাথায়।

মনসুর বলে, আহ্ ছাড়ো, ছাড়ো। লাগে, বড় লাগে।

তবু কান ছাড়ে না হায়দার। চষা মাঠের মাটিমাখা হাতে মনসুরের কান আরো জোরে মোচড়াতে মোচড়াতে সে বলে, তোমার পদরচনা সব শুনেছি। খালি হাতে পড়ে রইলাম রে? জ্ঞান হয়েছে? টের পাচ্ছ? বুঝতে পারছ?

এক ঝটকায় কান সরিয়ে নেয় মনসুর, কিন্তু আবুলের মতো ভোঁ দৌড় দেবার সাহস হয় না তার।

কানটা লাল হয়ে আছে, আহা। হায়দারের বুক ভেঙে যায়। কিন্তু শাসন বলে কথা। আসন না করলে বলদও মাঠ চষে না, মানুষও ঘরে ফেরে না।

বুকের মধ্যে মায়ার নহর, মুখে যেন বাজ-ঠাটার কহর, হায়দার বলে, সারাদিন মাঠে আমি লাঙল ঠেলি। ক্ষেত কোপাই। তুমি খাবে বলে হাত পুড়িয়ে ভাত রাঁধি। আর তুমি বনেবাদাড়ে নেচে নেচে সারিন্দা বাজাও? পদ রচনা কর? আবার এক চ্যালা জুটেছে?

সে চ্যালা আবুল মিয়া, সে এখন হাটের ভেতরে মানুষের সাগরে ডুব দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

উধাও আবুলের পথের দিকে তাকিয়ে হায়দার বলে, একবার পেলে তার নাচের ঠ্যাং যদি না আমি ভাঙি তো আমার নাম হায়দার শেখ না। চল বাড়িতে। আজ তোর একদিন কী আমার একদিন। বলেই আবার খপ্ করে কান ধরে মনসুরের।

চল বাড়িতে।

কানটা ছাড়ো, মিয়াভাই। লোকে বলবে কী?

বলুক, তারা বলুক। তারা দেখুক। যারা বলে আদর দিয়ে তোর মাথা খেয়েছি, তারা দেখুক, হায়দার শেখ শাসনও করতে জানে।

টানতে টানতে, কানের লতি মাকালের মতো লাল বরণ করতে করতে মনসুরকে বাড়িতে নিয়ে যায় হায়দার। তারপর ছাগলের খুঁটিতে ছাগলের দড়িতে পিঠমোড়া হাতজোড়া বাঁধতে বাঁধতে হায়দার বলে, বাপ মা বেহেস্তে যাওয়ার পর সেই ছোটকাল থেকে বুকেপিঠে করে এতবড় করেছি। নিজের সুখের দিকে তাকাই নাই। খালি আমার এক চিন্তা—তুই কিসে মানুষ হবি। কবে তুই মানুষ হবি।

ছাগল হয়ে মনসুর বাঁধা পড়ে খুঁটিতে। বেশ জুত করেই বাঁধনটা দিয়েছে মিয়াভাই। হাত কেটে রশি বসে গেছে। তা বসুক। রাগটা তো কমুক। মনুসর তো জানেই তার মিয়াভাইয়ের রাগ যেমন ধুলার মাঠে ভূতের চক্কর। এই ঘুর-ঘুর-ঘুর লাগে চরকি, পর মুহূর্তে নেই।

কিন্তু রকম-সকম দেখে আজ বড়-ধন্দ হয়। এ রাগ তো আসল রাগ বলেই মনে হচ্ছে। আরো কষে রশির বাঁধন বাঁধে আর হায়দার বলে চলে, আজ তোর কয়েদ। ভাইয়ের দুঃখ বোঝ না, সারিন্দার সুর বোঝ?

শেষ গেরোটা শক্ত করে হাত ঝাড়া দিয়ে হায়দার মুখের ঘাম মোছে গামছা দিয়ে। যেন পরিষ্কার হয়ে যেতেই মুখে তার মায়ার ছবি দেখা যায়। গলার স্বরও কোমল হয়ে আসে। বুকভরা হুতাশ নিয়ে সে বলে, দুই বছর আকাল। শস্য নাই। জমিদারের খাজনা দিতে পারি না। কর্জের উপর কর্জ। ভাই বোঝে না ভাইয়ের দুঃখ। ভাই আমার সারিন্দা বাজায়। পদ রচনা করে। হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে সে, পদ রচনায় পেট ভরে?

আওয়াজ শুনে পাশের বাড়ির বুড়ি নানি তার সাত বছরের টুকটুকে নাতনি বুঁচিকে নিয়ে লাঠি ভর দিয়ে আসে। ঘোলা চোখেও বুড়ি দেখতে পায়, আহা রে, মনসুর বাঁধা পড়ে আছে ছাগলের খুঁটিতে।

বুড়ি লাঠি তুলে হায়দারের পায়ে মারে খোঁচা। বলে, আরে বলদ, ভাই কি গরু-ছাগল? তারে বান্ধো খুঁটিতে?

কয়েদ, কয়েদ তার। হায়দার হৈহৈ করে বলে, পাড়াপড়শি তোমরা সকলেই আজ দেখবে, হায়দার জানে শাসন করতে কেমন কতটা। দেখি, সে কী রকম বাইরে যায়, ঘরে থাকে না, দেখি।

বুড়ি ফোকলা দাঁতে হেসে ওঠে।

তোমারও যেমন বুদ্ধি। তুমিও একটা বলদ। নিজে করলা না ঘরসংসার। তোমার আন্দাজ তাই হয় নাই।

একটু হকচকিয়ে যায় হায়দার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কেন, নানি? তোমার কথাটা কী?

আরে, জোয়ান ছেলে, জোয়ান বয়স, ছাগলের দড়ি দিয়ে তাকে বেন্ধে রাখা যায়?

মনসুর এতক্ষণে দলে লোক পেয়ে নানিকে দেয় নালিশ।

নানিগো, নানি, তুমি তাই বোঝাও মিয়াভাইকে।

ধমক দিয়ে ওঠে হায়দার, চোপ।

কাঁদো কাঁদো হবার ভান করে মনসুর বলে, ও নানি, নানিগো।

তার সেই কান্নার ভাব দেখে বুঁচি ওঠে খিলখিল করে হেসে।

হায়দারের গায়ে লাঠির আরেক খোঁচা মেরে বুড়ি বলে, এতবড় বলদ তুমি। জোয়ান ছেলে ঘরে রাখতে হলে দড়ি দিয়ে হয় না।

তবে কিসে হয়?

বৌ দিয়ে।

মনসুর আঁতকে ওঠে। আর্তনাদের মতো একটা স্বর বেরোয়। বাঁধন ঠেলে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করে সে।

হায়দার তার কাঁধে চাপ দিয়ে বলে, চোপ। তারপর নানির দিকে ফিরে তাকায় সে। মনে একটা আলো খেলা করে। বলে, কথাটা আবার কও তো নানি। বৌয়ের কথাটা কও।

বুঁচিকে কাছে টেনে বুড়ি বলে, জোয়ান ছেলে ঘরে থাকে ঘরে থাকলে বৌ। লাল টুকটুকে বৌ এনে দাও। ঘরে আবার থাকবে না?

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে হায়দারের মুখ।

ঠিক, ঠিক বলেছ, নানি। লাখ কথার এক কথা বলেছ। ওর আমি বিয়ে দেব। আজই আমি ঘটকের বাড়ি যাব। আজই। তারপর মনসুরকে তর্জন করে বলে, এখানে বাঁধা থাকবি সারাদিন। আগে আমি বেগুনের ক্ষেতটা কুপিয়ে আসি, তারপর, তারপর তোমার বৌ।

হায়দার হুমহাম করে ক্ষেতের দিকে চলে যায়।

মনসুর কাঁদো কাঁদো হয়ে বুড়িকে বলে, নানি, শেষে তুমি আমার এই সর্বনাশ করলে?

হি হি করে হেসে ওঠে বুঁচি। মনসুর লাল চোখে গরম করে তাকায়। ভয় পাবার মেয়েই নয় বুঁচি। সে উলটো বরং মনসুরকে জিভ বের করে ভ্যাংচায়।

নানি এই রকম-সকম দেখে বুঁচির হাত ধরে টান দেয়, আয় লো, আর তামাশা দেখে কাজ নাই।

মনসুর তাকিয়ে দেখে তার মিয়াভাই এখন দৃষ্টির বাইরে। বাড়ির পেছনে বেগুন ক্ষেতে কাজ করেছে সে। মনসুর মিনতি করে বুড়িকে বলে, নানি, ও নানি, যাওয়ার আগে দড়িটা খুলে দিয়ে যাও না?

ফোকলা দাঁতে বুড়ি হেসে ওঠে।

দাদারে, আমার আরো কিছুকাল বাঁচার সাধ। তোমার দড়ি খুলে দিলে আজই আমার কবর হবে। হায়দারের যে রাগ। সময়ে মনে হয় বাঘ, সময়ে সিংহ।

খিলখিল করে হাসে বুঁচি। বলে, বাঘ সিংহ বনে থাকে না, নানি?

বনেও থাকে, জনেও থাকে রে পাগলি। জনে থাকে যে বাঘ-সিংহ তার ডর আরো বেশি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ততক্ষণে একটা বুদ্ধি এসে গেছে মনসুরের মাথায়। সে বলে, ও নানি, তোমার এই নাতনি, এই বুঁচি, এর বিয়ে দেবে না?

কয় কী! মেয়েমানুষ, তার বিয়ে দেব না?

আমিও তো তাই বলি, নানি। বুঁচিকে তো তোমার বিয়ে দিতেই হবে। এখন না হয় ছোট আছে, একদিন তো বড় হবে। বুঁচি একদিন বোঁচকা হবে। তখন তার বিয়ে দেবে।

ধর, ততদিন যদি আমি অপেক্ষা করি?

বুড়ির ফোকলা দাঁতের ফাঁক বেয়ে রস গড়িয়ে পড়ে। খসখসে গলায় খুশি হয়ে বলে, অপেক্ষা করবি? বুঁচির জন্যে?

তবে আর বলছি কী? এখন আমাকে মিয়াভাই যদি এরকম বেঁধে রেখে বিয়ে দেয়, তাহলে কি আর তোমার সাধের নাতিন বুঁচিকে আমি বিয়ে করতে পারব?

বুড়ি বড় আতান্তরে পড়ে যায়।

হ্যাঁ, এটা তো বড় সঠিক কথা। ঘরের পাশে এমন জামাই, আর আমি আন্ধা এতকাল চক্ষে দেখি নাই? বলতে বলতে বুড়ি মনসুরের হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিতে বড় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। গেরো খুলতে খুলতে বলে, আরে আমার নাতিন জামাই, সর্ব অঙ্গে দড়ি কেটে বসে গেছে যে। ইস ইস ইস!

গেরো মুক্ত হতেই উঠে মনসুর পা টিপে টিপে বাইরের দিকে পা বাড়ায়। বুঁচি পেছন পেছন ছুটে আসে। বলে, কই যাও? বিয়া করবা না?

যাহ্, ভাগ। বলেই মনসুর এক লাফে রাস্তায় নামে।

রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে আবুল। হাতে তার মনসুরের সারিন্দা। ভাগ্যিস বড় বুদ্ধি করে আবুল তখন নিয়ে পালিয়েছিল, নইলে হায়দারের হাতে আজ সারিন্দা হতো শেষ।

লোকসকল, মনসুর তো জানে না—হায়দার মায়া করে শুধু ভাইকেই না, তার সারিন্দাকেও। মনসুরের পদ রচনার গৌরবে হায়দার এত দুঃখের ভেতরেও স্বপ্নের দেশে ঘোরে। এ দেশ গানের দেশ। আর সেই গানের দেশে গানের রাজা কি হতে পারবে না তারই ভাই—মনসুর?

মন-যমুনা ভাইটাল বাইয়া কোথায় কারে খোঁজে।

লোকসকল, পথ যায় কোথায় কেউ কি জানে? পথ হয় জগতের এক কথা। জগৎজুড়ে পথ। একেক পথে একেক পাওয়া। সকল পাওয়ার বড় পাওয়া মনের মতো মন পাওয়া।

পথে পথে আকুল বিকুল হাঁটে দুই বন্ধু।

মনসুর বলে, আজ খুব বাঁচা বেঁচেছি রে, আবুল। আজ এক বড় ফাঁড়া গুরুর আশীর্বাদে কেটে গেল রে। ঘরবাড়ি আমার ভালো লাগে না। কী সুখ আছে ঘরবাড়িতে?

চলতে চলতে জমিদার মহব্বত জঙের সাতমহলা বাড়ি দেখা যায়।

মনসুর বলে, ওই যে জমিদার বাড়ি, কত বড় বাড়ি, মহলের পর মহল, লোকজন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দাসদাসী, সোনাদানা। কোনো যাদুমন্ত্রে ওই রাজবাড়িও কেউ আমাকে দিলে, মন আমার বসবে না রে। আমার কী ইচ্ছা করে জানিস, আবুল? যেদিকে দুই চোখ যায়, চলে যাই। সব ঠাঁই আছে মানুষ। আর মানুষ তো সোনার মতন রে। সোনার মতন মানুষের দেশে ঘুরে বেড়াই। গান বাঁধি আর গান গাই। মানুষের মনের কথা মুক্তার মালার মতো গাঁথি। মানুষের সুখে হাসি। মানুষের দুঃখে কাঁদি। কাঁদি আর কাঁদাই। পথে পথে গান করি। গান গাই। এই আমার মনের মধ্যে মনের কথা, ভাই।

ঘোর লাগে আবুলের মনে। সেও আবেগে আবেশে বলে ওঠে, চলো না ওস্তাদ, চলো যাই। দুই ভাই পথে পথে গান গাই। গাছের ছায়ায় শয্যা পেতে থাকি, আকাশের তারা দেখি, আর পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মতো গানের সুরে জগতের দুঃখকষ্ট ডুবাই। চলো না যাই।

সাতমহলা বাড়ির পেছনে বাগান। সেই বাগানের দেয়ালের ওপারে এক নিমবৃক্ষের ছায়ায় সারিন্দা কোলে বসে পড়ে মনসুর। মনটা তার উদাস হয়ে যায়। চষা ক্ষেতের মাটিমাখা মিয়াভাইয়ের মুখ মনে পড়ে যায়।

বলে, আবুল রে, যেতে তো চাই। পথের উজান, পথের ভাটি, নদীর বান, ফসলে বান, ইচ্ছা করে সব আমি পার হয়ে যাই, যাই আবার ফিরি, আবার যাই। কিন্তু ওই যে আমার মিয়াভাই। বাপ জানি নাই, মা জানি নাই, তার মনে দুঃখ দিয়ে বল আমি কোথায় যাই? আমি যেখানেই যাই, ফেরার জায়গা তো ওই একটাই, আমার সে মিয়াভাই।

বিরক্ত হয় আবুল। বলে, তাহলে আর কী! দড়ি খুলে পালিয়ে তোমার লাভটা হলো কী? তোমার যেমন মন দেখছি, দুদিন বাদে বিয়েও করবে, ঘরসংসার করবে, আর তোমার এত সাধের সারিন্দা দেবে গাঙের পানিতে ভাসিয়ে।

মনের মধ্যে হঠাৎ একটা নতুন গানের পদ শঙ্খনীল পাখির মতো উড়াল দেয়।

মনসুর বলে, কেন? যদি তেমন কন্যা পাই? সারিন্দা যে মাথায় করে রাখে, বুকে করে রাখে, গানের সুর সুধা বলে পান করে, তেমন কন্যা কি আর নাই?

আবুল মাথা নাড়ে।

না ওস্তাদ, তেমন কন্যা এই জগতে নাই। সব কন্যাই এমন কন্যা—সোনা চাই, দানা চাই, রাজার বাড়ির শ্বেতহস্তী চাই। আমার তো মনে হয়, তোমার কপালে বিয়েও বুঝি নাই। কারণ, এমন জোড়া এই জগতে সৃষ্টি হয় নাই। অতএব তোমার জোড়া নাই।

নাই?

কবির মন কি নাই বলে কিছু কোনোদিন মানে এই জগতে?

কবির কাছে সকলই আছে। মনসুর রহস্যভরা সুদূর গলায় আবারো বলে, নাই? কোলের সারিন্দা বুকের ওপর আড় করে তুলে ধরে সে, তারে দেয় টংকার, বলে, নাই?

‘জগতে সকল কিছুর হায়রে জোড়া জোড়া
কেবল আমার জোড়া নাই?
আমি এতই কপালপোড়া
আমি না বিধাতার নিজের হাতে গড়া
গড়ে নাই আমার কোনো জোড়া?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাই হয় নাকি রে ভাই?'

মনসুরের সারিন্দা শঙ্খনীল পাখির মতো আকাশভরা ডাক দেয়। মনসুরের গলা প্রান্তরে উড়াল দেয় পরীদলের মতো কলকল খলখল করে।

সহসা শঙ্কিত হয়ে পড়ে আবুল। মনসুরের মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে বলে, কর কী ওস্তাদ। পাশেই জমিদার বাড়ির জেনানা-বাগান। গলা ছেড়ে গান করছ, পাইক-পেয়াদা এসে যদি ঠ্যাংগায়?

এহ্, ঠ্যাংগায়? শালা জমিদারের ঘরে আমি সিঁদ দিচ্ছি? আমার গলার গান আমি জমিদারের কাছে বন্ধক দিয়েছি? আমি স্বাধীন, আমার গান স্বাধীন, আমার গলা স্বাধীন। শোন, শোন কী চমৎকার পদ এসেছে আমার মনে। শোন।

চোখ বুজে, তন্ময় হয়ে সারিন্দায় অনেকক্ষণ ধরে সুর তোলে মনসুর। তারপর সমস্ত আকাশ ভরিয়ে গলা ছড়িয়ে দেয় সে।

'চখা হলে আছে চখী,
সখা পেলে হয় রে সখী
আমি তো এই বিধানের উলটা দেখি নাই।
তবে এই কথা বাকি,
আমি যে এই একাকী,
কারণ আমার জোড়া আমি তারে চিনতে পারি নাই।'

লোকসকল, তবে শুনুন, এই রকমই হয়, এ কোনো রূপকথা নয়। বাগানে তখন শীতল ছায়ায় বসে মালা গাঁথছিল জমিদার মহব্বত জঙের বোন চাঁদ সুলতানা। আর তার পাশে পা মেলে বসে মহব্বত জঙের বিবি নূরজাহান গতরাতের লীলাকামের স্বপ্নে মাতাল হয়ে দেখছিল সেই কুসুম গাঁথা।

কুসুম যেন নয়, দেহের সঙ্গে দেহ, আর সেই দেহ দিয়ে গাঁথা এই মানব জনমের ধারা। সেই গল্পই ননদের কাছে ভাবি আজ সারা বিকেল করছে কত ইশারায় কত সংকেতে সুবাসে।

ওই যে দেয়ালের ওপারে কে গাইছে,

'আছে সে কোথাও আছে
কী জানি কি এত কাছে,
সে এত কাছে আছে বলেই তারে ধরতে পারি নাই।'

মালা গাঁথার সুঁচে হঠাৎ হাত ফুটে যায় চাঁদ সুলতানার।

গল্প বুঝি সত্যি হয়ে যায়।

সুবাস তাকে আকুল হয়ে জড়ায়। লজ্জা ওড়ে হঠাৎ এক হলুদ ফড়িং। চাঁদ সুলতানা মুখে আঙুল পুরে রক্ত চুষে নেয়।

রক্ত নয় তো সুধা। জ্বালা নয় তো সুখ।

মনের কথাটি মুখে উঠে আসে ফড়িংয়ের পাখার মতো গুঞ্জন করে, কে গায়? মানুষ বুঝি, সে বুঝি মানুষ কোনো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রহস্য করে নূরজাহান বলে, জমিদারের বোন তুমি, জমিদার তোমার ভাই। হুকুম দিলেই পেয়াদা পাঠাই।

তাই?

এক্ষুনি ধরে আনবে। বেঁধে আনবে। হাজির করবে বিবির সামনে।

তারপর?

তারপর? আর কী? জিগ্যেস করব, কে তুমি, তোমার এত সাহস যে বিবি চাঁদ সুলতানার মন চুরি করে পালাও?

আধেক গাঁথা মালা থেকে একটা একটা করে ফুল এবার খুলতে থাকে চাঁদ। বলে, আমার মন অত আগল খোলা না যে যখন তখন চুরি হবে।

নূরজাহানও রহস্য করে বলে, চোর যদি চতুর হয়, হাজার আগল বন্ধ করে রাখলেও চুরি হয় লো, চুরি হয়।

চাঁদ সুলতানা সকল কুসুম দু'হাতে মুঠো করে ছড়িয়ে দেয়, উড়িয়ে দেয়। বলে, ইস, একবার যদি সামনে পাই তো দেখি কেমন চতুর সেই চোর।

নূরজাহানের শরীর ভরা গতরাতের সোহাগে। এই সোহাগ এমন সোহাগ না রাখা যায় আপন করে, না রাখা যায় গোপনে। ইচ্ছা করে ভাগ করে নিই।

চাঁদের গালে ঠোনা দিয়ে নূরজাহান বলে, সামনেই ধরে দেব লো, সামনেই ধরে দেব। দেখি সে কেমন চতুর চাঁদ করল চুরি।

লোকসকল, মনসুর বয়াতির এই প্রেমকথা ব্রহ্মপুত্রের মরাখাতে আজও আছে যতটুকু জল, তারই ঢেউয়ে আছে।

তবে দেখি নূরজাহান এখন কী করে?

কী করে সে, কী করে? ননদের বুকের মধ্যে যে কথা সে সেই কথা শুনতে পেয়েছে বিনিভাষায়, এনে দাও সেই মানুষ, হাতে যার সারিন্দা, গলায় যার গান, গান তো নয় হাতকড়া, মানুষ করে বন্দি, সারিন্দা তো নয় সিঁদকাটি, হৃদয় করে চুরি।

কিন্তু সকল কথা কি খুলে বলা যায় স্বামীকে? বলে শুধু, সেই মানুষটিকে এনে দাও। গান শুনব।

পাইক ছোটে, পেয়াদা ছোটে।

এই দেশে সারিন্দা কে বাজায়? পদ রচনা করে কে?

সকলেই মনসুরের কথা বলে।

ঢোলে পড়ে বাড়ি, গ্রামগঞ্জ হাটবাজারে এলান হয়।

এক পাইক যদি বলে, হুকুম, হুকুম, হুকুম। আমাদের হুজুর মনসুর বয়াতির গান শুনবেন, জলদি তাকে হাজির করা চাই।

তো আরেক পাইক বলে, হুজুরের হুকুম, মনসুরকে বেঁধে আনা চাই।

তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরেক পাইক মোচে তা দিয়ে হুংকার দিয়ে ওঠে, বেঁধে আনা চাই, বেঁধে আনা চাই। বেঁধে আন, বেঁধে আন, মারতে মারতে কাছারিতে আন।

মনসুরের বাড়িতে মনসুর নেই। হায়দার বেগুন ক্ষেতে পানি দিচ্ছিল, তার গর্দান চেপে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ধরে পাইকেরা।

চেল্লাচেল্লি করে তারা বলে, তোর ভাই কোথায়, হারামজাদা?

সে বাড়িতে আছে কি নাই?

গেরেফতারের হুকুম আছে।

ভালো চাষ তো বের করে দেয় তাকে।

হায়দার কিছুই বুঝে উঠতে পারে না, হঠাৎ কেন জমিদারের যমদূত পাইকেরা খোঁজ করছে মনসুরের। জনে জনে পায়ে ধরে সে বলে, না না, সে কোনো দোষ করে নাই। সে বাড়িতে নাই। দোষ যদি হয়ে থাকে আমার হয়েছে। জমিদারের কাছারিতে আমার কর্জ, আমার টিপসই। কর্জ শোধ দিতে পারি নাই। খাজনা আমি দিতে পারি নাই। আমাকে তোমরা নিয়ে যাও। মনসুরের কোনো দোষ নাই।

পাইকেরা সারা বাড়ি ভেঙে তছনছ করে সন্ধান করে।

নাই, মনসুর নাই।

মনসুর নাই তো, বকশিশেরও আশা নাই।

হুজুর বুঝি জ্যান্ত পুঁতে ফেলেন তাদের।

ভয়ে ভয়ে কাছারিতে ফিরে যায় তারা। গিয়ে দেখে, তাজ্জব ব্যাপার। হুজুর বসে আছেন সিংহাসনে, আর তাঁর সমুখে দাঁড়িয়ে আছে মনসুর। ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে বসে সারিন্দার সুর তুলে পদ রচনা করছিল সে, পাইকের অন্য একদল তাকে ধরে বেঁধে এনে হাজির করেছে খানিক আগে। হাজির করবার বকশিশ পেয়ে তারা এখন চাকর-মহলে গাঁজার ছিলিমে সুখটান দিচ্ছে হাত ফেরাফেরি করে।

এমন কাঞ্চন পুরুষ দেখবাম রে আমি

জমিদারের সদরে আজ মানুষ কত শত। অন্দরেও কান পেতে সাত সাত মহলের নারী যত।

তার মধ্যে চিকের আড়ালে ভাবি আর ননদিনী—নূর আর চাঁদ।

সিংহাসনে বসে আছেন মহব্বত জঙ।

তাঁর সমুখে বুক টান করে দাঁড়িয়ে আছে মনসুর বয়াতি।

আরে, আরে, গরিব কৃষকের এতিম সন্তান, নাই তার জমি, আছে কর্জ পাহাড়প্রমাণ, তার এত তেজ?

মনসুর বয়াতি বলে, হুজুর, যদি অভয় দেন তো একটা কথা কই।

দিলাম অভয়।

আপনি জমিদার, আমি প্রজা। সেই আপনার আছে পেয়াদা আর আমার সারিন্দা।

তুমি তো বেশ মজার কথা বলো হে।

সেলাম করে মনসুর বলে, একজনের কাছে মজার, কিন্তু আরেকজনের কাছে তা দুঃখের হয়, হুজুর। পেয়াদাকে আপনি হুকুম দিলে সে ধরে আনে, ধরে আনতে বললে, বেঁধে আনে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আর মারতে মারতে সেই দণ্ডে হুজুরে এনে হাজির করে। করে কিনা কন?

মহব্বত জঙের বড় ক্রোধ হয় লোকটির কথা শুনে। বিশেষ, কাছারির মাঠে এত কর্মচারী পাইক পেয়াদা প্রজা উপস্থিত। চাবুক লাগাবার হুকুম দেবারই কথা।

কিন্তু তাঁর বিবির সাধ গান শুনবেন। বিবি নূরজাহান আছে চিকের আড়ালেই। বিবির বড় বাধ্য তিনি। বিবির বড় বশ। অগত্যা মনের রাগ মনে রেখেই মহব্বত জঙ বলেন, আচ্ছা, সে বিচার আমি করব, বয়াতি। তুমি এখন গান ধর।

তারপরও লোকটির সাহস দ্যাখো, লোকসকল।

মনসুর বলে, সেইখানেই তো কথা, হুজুর। আমি তো পারি না আমার সারিন্দাকে হুকুম দিতে যে সুর আনো। এই সারিন্দাকে তো হুকুম করা যায় না—বাজো, তুমি বাজো।

তোমার ওই সারিন্দা তো যন্ত্র একটা। বাজালেই বাজবে। বাজাও।

আবুলের হাতে ছিল সারিন্দাটা। মহব্বত ভেবেছিলেন, এবার মনসুর সারিন্দাটা নিজের হাতে নেবে। কিন্তু না।

মনসুর বলে, হুজুর, প্রজার ওপর হুকুম খাটে, সময়ে তাও যে খাটে না তাও আপনি জানেন। তবে, সুরের ওপর যে হুকুম একেবারেই খাটে না। হুকুমে গান হয় না।

লোকটির স্পর্ধা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে মহব্বত জঙ প্রশ্ন করেন, কিসে হয়?

মনের যদি ইচ্ছা হয়, তবে হয়।

বেশ, তবে ইচ্ছাটাই কর দেখি।

আর, ইচ্ছাও তো কেবল একার না, হুজুর। দুই তরফের ইচ্ছা। যে গায়, তার ইচ্ছা। যে শোনে, তার ইচ্ছা। দুই তরফের ইচ্ছা যেন নদীর দুই ধারা। এক ধারাতে মিললে পরে তবে গান হয়।

মহব্বত জঙ বিষয়ী মানুষ। তিনি জানেন, এভাবে কথা চললে চলতেই থাকবে, গান হবে না। মুখে প্রশস্ত হাসি রচনা করে তিনি এবার বলেন, বয়াতি, তবে শোন, বাড়ির ভেতরে সকলেরই ইচ্ছা তোমার একখানা গান শোনে।

সদরের সঙ্গে তর্ক চলে, অন্দরের সঙ্গে চলে না।

অন্দরের উদ্দেশে মাথা ঝুঁকিয়ে মনসুর বলে, তবে আমার সেলাম জানাই বাড়ির ভেতরে। আর তাদের কাছে এই নিবেদন করি, গান শোনার ইচ্ছাই যদি করেন, তবে নিশ্চয় তো বোঝেন, হারে, মানুষের উপর জুলুম চলে, সুরের উপর চলে না।

লোকসকল, কী করে আপনাদের নিয়ে যাই অন্দরে এখন? এ আমার কর্তব্য হয় না।

লোকসকল, শুধু এইটুকু বলি, মনসুরের এই কথা শুনে চাঁদ সুলতানার ভেতরের পাখি ঝটপট করে ওঠে।

লোকসকল, কোথায় এক আশ্চর্য কুসুম ফোটে। এতবড় কুসুম কেউ কখনো চোখে দেখেনি।

সদরে সিংহাসনে আসীন মহব্বত জঙ আর ধৈর্য ধরতে পারেন না। তিনি প্রায় চিৎকার করে ওঠেন, তোমার ভারি তেজ দেখছি, বয়াতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিপরীতে কুসুম-কোমল গলায় মনসুর উচ্চারণ করে, তেজের কথা নয়, হুজুর, ভাবের কথা। আর ভাব? কেমন সেই ভাব?

হাত বাড়ায় মনসুর। তার হাতে সারিন্দা তুলে দেয় আবুল।

সারিন্দায় টংকার দিয়ে মনসুর বলে, বলো, কেমন সেই ভাব? যেন সে বনের পাখি। এত বলেই মনসুর চোখ বোজে। যেন জগৎ মুদিত করে স্বপ্নের ভেতরে সে দাঁড়ায়। মুখে মুখে রচনা করে চলে সে পদের পর পদ।

'বনের পাখি মনের সুখে বনে থাকে।
যখন তার মন চায় দুই পাখায় সে
ওই নীল আসমানে উড়াল দেয় রে।
সে কারো, সে কারো শিকল পরে না।'

দোহার ধরে আবুল, সে কারো শিকল পরে না।

মনসুর সেলাম করে বলে, হুজুর, এ আমার সাথের সাথী আবুল, আমার সাগরেদ। আবুল, তুইও তো সুরেরই সাধনা করিস। ভাবের জগৎ তুই জানিস। বল দেখি সত্যি কিনা এই কথা—

'বনের পশু বনের রাজা বনে থাকে
যখন যেথা ইচ্ছা তার ঘুরে বেড়ায় সে
গাছের ভিতরে আর ঝিলের কিনারে।
সে কারো, সে কারো ধার ধারে না।'

দোহার ধরে আবুল, সে কারো শিকল পরে না।

মনসুর বলে ওঠে, বারে বা। বুঝলেন হুজুর, গান আর ইচ্ছা, সুর আর মন, এই হলো আসল কথা। তারপর আবার ফিরে যায় পদ রচনায়।

'মানুষের মন ঠিক য্যান সেই রকম
তার মন যখন যা চায় তাই করে।
সে স্বাধীন, নয় পরাধীন এই মন রে।
সে কারো, সে কারো ফান্দে পড়ে না।'

দোহার ধরে আবুল, সে কারো ফান্দে পড়ে না।

মনসুর তাকে উৎসাহ দেয়। গুরুর উৎসাহ বিনা শিষ্যের কী অর্জনের ভরসা? আবুল নিজেই রচনা করে তখন, মনের সুর, সারিন্দার সুর, গলায় সুর, এই তিন সুর, মিলে মিশে হয় যে সঙ্গীতের সুর, সেই সুর কেমন সুর? এই অন্তরের সুর?

উত্তর দেয় মনসুর, সে কারো, সে কারো চাকরি করে না।

তবে কী করে?

আহা, কী করে?

কী করে?

মনসুর এবার তার গানের গলাটিকে শঙ্খনীল পাখির পাখায় আকাশে দেয় উড়িয়ে।

'বন্দি করে, বন্দি করে, সুরের এই যাদু মন্তরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পাষাণও গলিয়া যায়
চক্ষুও ভাসিয়া যায়
শিকলও কাটিয়া যায়
সুরের এই যাদুমন্তরে।
বঁধুরও বন্দি হিয়া
যায় সে পাখি হইয়া
সুরের এই যাদু মন্তরে,
মনের সুরে গানের সুরে বঁধুর অঞ্চল টেনে রে
ঘরেরও বাহির করে রে।'

লোকসকল, অন্দরে যদি আপনাদের নিয়ে যেতে পারতাম, তবে দেখাতে পারতাম চাঁদ সুলতানার মুখ যেমন ডালিম ফুলের বরণ, তার ঘর-বাহিরের দিকে ঝুঁকে পড়া ডাল। ননদিনীর মনের ভাব, মুখের ভাব দেখে নূরজাহানের বুক ওঠে থরথর করে।

সদরে তখন দাপ ওঠে ঘোড়ার। সারিন্দার সুর আর গায়কের গলা ছাপিয়ে হাঁক ওঠে ভিন-জমিদার ফিরোজ দেওয়ানের নকিবের।

ফিরোজ দেওয়ান আসছেন, ফিরোজ দেওয়ান আসছেন।

সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়ান মহব্বত জঙ।

জনতার মধ্যে পড়ে যায় শোরগোল।

কী বার্তা? কী বার্তা? অসময়ে কেন ফিরোজ দেওয়ান?

বলতে না বলতে ধুলা উড়িয়ে, মহব্বত জঙের সিংহদরোজা পেরিয়ে, একেবারে বার মহলের সিঁড়ির গোড়ায় এসে ঘোড়া দাঁড়ায়। পাইকেরা আসাসোঁটা ঘুরিয়ে তফাত তফাত করে জনতা।

ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নামেন ফিরোজ দেওয়ান। পাশের পরগনার জমিদার। তার মুসলমান প্রজারা তাঁকে বলে রঙ্গিলা শাহা। হিন্দুরা বলে কেষ্টরাজা। কারণ তিনি বাঁশির বড় পাগল। বাঁশি তাঁর হাতে যেমন বেদের হাতে সাপ। বেদে খেলায় সাপ আর তিনি খেলান সুর। রাজবাড়িতে রাতদুপুরে বাঁশির ওঠে সুর। ফিরোজ দেওয়ানের বাঁশির সুরে অমাবস্যাও পূর্ণিমা হয়ে যায়।

সেই রঙ্গিলা শাহা, সেই কেষ্টরাজা, সেই ফিরোজ দেওয়ান কেন জানান না দিয়ে মহব্বত জঙের পুরীতে?

ঘোড়ার দাপে, মানুষের ঠেলাঠেলির চাপে মনসুর বয়াতি আর তার শিষ্য আবুল যায় কোথায় ভেসে। মনসুরের বুকে রাগের সাপ ফণা তোলে।

গানের কোনো দাম নাই কোনো রাজার পুরীতে।

বুকের কাছে সারিন্দাটা চেপে মনসুর বেরিয়ে যায় কাছারি সদর থেকে।

চিকের আড়াল থেকে দ্যাখে। কে দ্যাখে? আর কে দ্যাখে? যার দেখার সেই দ্যাখে। বিবি চাঁদ সুলতানা দ্যাখে বয়াতির ওই চলে যাওয়া।

ভাবির হাত ধরে, ঠোঁট ফুলিয়ে চাঁদ বলে, এটা কেমন হলো? তোমরা এটা কেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করলে? খালি হাতে বিদায় করলে তাকে? পান দিলে না? সুপারি দিলে না? পুরস্কার দিলে না? খালি হাতে ফিরিয়ে দিলে?

তোর ভাইয়ের প্রাণের বন্ধু এসে পড়ল যে।

আর কারো প্রাণ নাই বুঝি?

নূরজাহান ননদিনীর গালে ঠোনা মেরে বলে, তো কী করতে হবে বল!

লাজে ভেঙে চাঁদ বলে, বয়াতিকে একখানা চাদর দিতে প্রাণ চায়।

নূরজাহান রহস্য করে বলে, চাদর দিবি, এ আর এমন কী কথা? আমি ভাবলাম এমন কাঞ্চন পুরুষ, মন দিয়েই বুঝি বসে আছিস, হতভাগী।

দৌড়ে নিজের ঘরে গিয়ে খিল দেয় চাঁদ।

নূরজাহান তার খাস বাঁদি মতিকে ডেকে পাঠায়। তোরঙ্গ থেকে ঢাকাই শাল বের করে তার হাতে দিয়ে বলে, যা, যেখানে তাকে পাস, তার হাতে দিবি চাঁদবিবির নাম করে। পরক্ষণেই মনে হয়, অবিবাহিতা কন্যা, তার নাম করে চাদর দেয়া কি ভালো দেখাবে? মতিকে আবার সে বলে, না না, দিবি তাকে এই চাদরখানা আমার নাম করে।

এক বিরিক্ষ ছায়া দেয় রে, আরেক বিরিক্ষ আগুন।

ফিরোজ দেওয়ান পান খান, সুপারি খান, তারপরে তার প্রাণের বন্ধু মহব্বত জঙকে বলেন, বাইরে, আমার বুবু আজ তিনদিন নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। আমার রাজবাড়ি থমথমে। ঝাড় লণ্ঠন জ্বলে না। দাসদাসী ভয়ে কাছে আসে না। আমি মনে শান্তি পাই না। ওই ক'দিন আমার বাঁশি পর্যন্ত বাজাইনি, জানো?

ফিরোজ দেওয়ান শরবত খান, শরাবে চুমুক দেন মহব্বত জঙ্গ। চুমুক দিয়ে হা হা করে হাসতে হাসতে বলেন, শরাবের মজা শরবতে নাই, বৌয়ের মজা বাঁশিতে নাই। এই কথাটাই তুমি বুঝলে না, দেওয়ান। এবার বাঁশি ফেলে বৌ ধর। সময় হয়েছে, বিয়ে কর। বুবুর মুখে হাসি ফোটাও। আঁধার ঘর আলো কর। বৌ আন।

ফিরোজ বলেন, বাঁশি সে বাঁশিই রে, ভাই। এই বাঁশিতেই আমি ভুলে ছিলাম সব। তবে, বিধবা হবার পর বুবু আমার পুরী সামাল দিতে দিতে এখন আর পারেন না। বৌ এবার আনতেই হবে দেখছি। উপায় নেই। তবে যদি আনতে হয়, অন্য কোথাও থেকে নয়, বুবুর ইচ্ছা—সম্পর্ক হয় তোমার সঙ্গে।

এ তো আর ঘটকের মধ্যে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে শতেক কথার মারপ্যাঁচ নয়। এ হলো দুই বন্ধুর কথা।

মহব্বত বড় খুশি হয়ে আরেক পাত্র শরাব ঢেলে লম্বা চুমুক দিয়ে বলেন, অর্থাৎ তুমি আমার বোন চাঁদ সুলতানার সঙ্গে তোমার বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছ।

হ্যাঁ, সে জন্যেই তো এলাম। এতদিনের বন্ধু তুমি, প্রাণের বন্ধু, বারো ভুঁইয়ার দুই ভুঁইার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুই পুত্র তুমি আর আমি। ঘটকে কী কাজ? নিজেই চলে এলাম।

মহব্বত জঙ ফিরোজের কাঁধে চাপড় মেরে বলেন, ভালো মিলবে দু'জনে। দু'জনেই সঙ্গীতের পাগল। ওই সঙ্গীত-টঙ্গীতের মধ্যে তোমরা কী পাও, আমি বুঝি না।

যে যা বোঝে রে ভাই, যে যা বোঝে। ঘরের কোণে পড়েছিল গেলাপবন্দি সেতার। সেদিকে দেখিয়ে ফিরোজ দেওয়ান বলেন, নইলে তোমার ঘরে সেতারে এত ধুলা জমে?

হা হা করে হেসে ওঠেন মহব্বত জঙ। বলেন, আরে, ওটা কি আমার? ওটা এনে দিয়েছিলাম চাঁদ সুলতানাকে। কিন্তু তার আবার বাজনার দিকে মন নেই। গানের দিকে ঝোঁক। তাও আবার ঠুমরি খেয়াল হলে কথা ছিল। তা নয়। তার পছন্দ দেশী গান। গরিব মানুষের গান। হাঃ হাঃ হাঃ। পথের ঘাটের গান।

বুকের মধ্যে হঠাৎ একটা ফুল ফোটে ফিরোজ দেওয়ানের।

এ ফুল, বিলের ফুল। থই থই বিলে ফোটা পদ্ম ফুল।

ফিরোজ বলেন, পথেঘাটেও মানিক আছে, মহব্বত জঙ। আমার দেশের মাটিতে যে গান আছে, তার সুর, তার ভাব তার কথা, সে যে কত সুন্দর, কত গভীর, প্রাণের কত কাছের, নিশ্চয়ই চাঁদবিবি বোঝে।

তারপর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে, লোকে যাকে বলে রঙিলা শাহা, বলে কেষ্টরাজ, সেই ফিরোজ দেওয়ান বলেন, যেনবা চাঁদ তাঁর সমুখেই এখন, তিনি বলেন, কী বলেন?—বলেন তিনি, তবে সে আমাকেও বুঝতে পারবে।

লোকসকল, আর ওদিকে তখন কী হয়?

নূরজাহানের খাসবাঁদি মতি তখন পৌঁছে গেছে মনসুরের বাড়িতে, চিত্রকরা কুলার ওপর ভাঁজ করে ঢাকাই শাল সাজিয়ে।

রঙিলা দাসী জানে এ শাল নূরজাহান বিবি নিজের নাম করে পাঠালেও আসলে তা কার পাঠানো। সেই কথাটা মতির মনে খলবল করে।

চোখ নাচিয়ে পানরাঙ্গা ঠোঁটে হাসি ভাসিয়ে সে বলেই ফেলে, বয়াতি, তোমার কপাল। জমিদারের বোন চাঁদবিবি নিজের হাতে এই শাল তোমাকে পাঠিয়েছেন।

জমিদার বাড়ির খাসবাঁদি মনসুরের খোঁজে এসেছে দেখে কাছেই ঘন হয়ে ছিল হায়দার। শালখানা দেখে তার চক্ষুস্থির।

এ যে রাজপুত্রের অঙ্গেই শোভা পায়?

কোথায় রাজপুত্র আর কোথায় তার মতো গরিব চাষার ভাই মনসুর, তাও কিনা সে এক পাগল, আর বাজায় সে সারিন্দা, রচনা করে পদ। তবে এত মূল্য হয় বুঝি পদ রচনায়?

বেগুন ক্ষেতে মন দেয় না বলে কত গঞ্জনা করেছি রে তোকে—বুকের মধ্যে এই হাহাকার আর চোখের মধ্যে খুশির ঝিলিক নিয়ে আকাশে মাথা ছুঁইয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মনসুরের মিয়াভাই হায়দার।

হায় রে, সে যদি জানত, এই শালই হবে কাল। গানের পদেই বিপদ রচনা, আহা, কেউ কি জানে, জানতে পারে আগাম কথা?

মতি বলে, বয়াতি, এ বড় মানের শাল, এ বড় দানের শাল। তোমার গান শুনে খুশি হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ইনাম পাঠিয়েছে গো। একবার হাতে নিয়ে দ্যাখো।

মনসুর ছুঁয়েও দ্যাখে না, তাকিয়েও দ্যাখে না।

হায়দার বলে, আরে, বলদের বলদ, হাত বাড়িয়ে ইনাম নে। রঙিলা শাহা এসে পড়লেন না বলেই গানের আসর ভেঙে গেল। নিশ্চয়ই পরে তারা বুঝতে পেরেছে, এত বড় গায়ক—তার সম্মান করা হলো না। এটা ঠিক হয় নাই। তাদের 'পরে আর রাগ করে থাকিস না। নে, হাতে নে, ধর।

হায়দার নিজেই চিত্রকরা কুলার ওপর থেকে শালখানা নিয়ে ভাইয়ের হাতে দেয়। বলে, একবার গায়ে দে, ভাই। চোখ ভরে দেখি।

মতিও পানের রসে ডুবুডুবু গলায় বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, গায়ে দাও। আমি চোখে দেখে বিবিরে গিয়ে বলব, তার চাদর গায়ে পরেছ তুমি।

মনসুর মনের মধ্যে নিজেকেই দেখে ভারি অবাক হয়ে যায়। এই যে ছিল একটু আগে এত আগুন-রাগ, এখন সেই আগুনের মধ্যে পদ্মের রঙ ফুটেছে কোন যাদুতে।

এ যাদু কেমন যাদু? কোন-বা যাদু?

মনসুর শাল হাতে নিয়ে ইতস্তত করছে দেখে হায়দার ভাইয়ের হাত ধরে বলে, মনসুর রে, তুই কতদিন আমার কাছে একখানা চাদর চেয়েছিলি। আবদার করেছিলি, কত আসরে যেতে হয়, বয়াতির গায়ে একখানা ভালো চাদর না হলে মানায়? আমি গরিব, আমি হতভাগা তোর ভাই, আমি তোকে চাদর দিতে পারি নাই, রাজার খাজনা দিয়ে পয়সা কুলাতে পারি নাই রে। আর আজ দ্যাখ, তুই নিজেই পেয়ে গেলি। তাও সুতির নয়, পশমি শাল। জরির কাজ করা রাজাবাদশার শাল। হায়দার এবার মতিকে বলে, তুমি বিবিকে গিয়ে বোলো, আমরা খুব খুশি হয়েছি। তার ঠাঁই হাজার হাজার সেলাম পৌঁছে দিও আর বোলো—এ শাল আমার ভাই মাথায় করে নিয়েছে।

ঠাটা পড়ে, ঠাটা। মানুষের কথার চেয়ে বড় ঠাটা নাই।

মনসুর বলে ওঠে, না। এ চাদর আমি নেব না, দাসী। তুমি কর দাসকর্ম, তোমার কোনো দোষ নাই। তুমি তারে গিয়ে বোলো, এই নামে বয়াতির কোনো দরকার নাই।

হায় হায় করে ওঠে মতি। পানের রস গাল বেয়ে পড়ে তার। মাথা থাবড়ে বলে, আমি করি দাসকর্ম, এ চাদর ফিরিয়ে নিতে আমার সাধ্য নাই। ফেরাতে হয়, তুমিই তাকে নিজের হাতে ফিরিয়ে দিও, বয়াতি।

মনসুর তখন উত্তর দেয়, বেশ, আমিই তাকে ফিরিয়ে দেব, তুমি এখন বিদায় হও।

হায়দার সংসারী মানুষ, বিষয়বুদ্ধি আছে তার, সে এক প্রশ্ন তোলে, ফিরিয়ে যে দিবি তুই, কোথায় পাবি দেখা? রাজার ঝি রাজবাড়িতে সাতমহলের গভীর অন্দরে থাকে। পরপুরুষের সঙ্গে তার দেখা হয় কেমনে?

মনসুর বলে, কেমনে দেখা হয় সে দেখা যাবে। বাগানে সে ফুল তুলতে আসবে, আমি জানি আসে। রোজ আসে। দাসী, তুমি তারে কইও গিয়া, আমি আসব বাগানের পাছদুয়ারে। সে যেন উপস্থিত থাকে।

লোকসকল, এক বৃক্ষ ছায়া দেয়, আরেক বৃক্ষ আগুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

লোকসকল, আগুনবৃক্ষের তাপ লাগে চাঁদ সুলতানার গায়ে।

না না না করে ওঠে তার অন্তর।

ফিরোজ দেওয়ানের ছবি তার মনে ফোটে না, মনে ফোটে মনসুর বয়াতি।

ভাবি নূরজাহান বিবির পায়ে ধরে সে বলে, ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও তাকে।

নূরজাহান স্বামীর কাছে কোন মুখে কোন সাহসে বলে তার ননদিনীর বুকে বয়াতির ছবির কথা?

সে বলে, কী বলে? লোকসকল, সংসারে নারীর বুকে গোপন ভালোবাসা যখন সাপে দংশাতে চায়, তখন নারীর মুখে এই একই বাক্য ভাষা পায়, নূরজাহান বলে, মন তৈরি নয়।

বিবির কাছে এ কথা শুনে মহব্বত জঙ হা হা করে হেসে ওঠেন। বলেন, মেয়েমানুষের মন হয় এত অদ্ভুত উদ্ভট পয়দা। নারীর মন বলে কিছু নাই, বিবি। নারীর মন আমি বুঝি না।

এত বলে নূরজাহানকে বুকের কাছে টানেন মহব্বত জঙ। বুঝিবা বসনই তার চুরি করে রাতের আগেই এই দেহচোর।

স্বামীকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দেয় নূরজাহান। বলে, মন বোঝেন না, এই বোঝেন?

দুয়ার দাও বন্ধ কর। দেখি তোমার মন আছে দেহের কোন কন্দরে?

নারীর কি ক্ষমতা আছে এই সমাজ-সংসারে? দেহই ক্ষমতা তার পুরুষের এই পৃথিবীতে।

নূরজাহান নিজেই লাগিয়ে দেয় দুয়ার। নিজেই চোর হয়ে চুরি করে নিজের বসন। ননদিনীকে বড় ভালোবাসে সে। ফিরোজ দেওয়ানকে ফিরিয়ে দেবার কথা স্বামীর কাছ থেকে আদায় করে নেবার মুহূর্ত সে রচনা করে দ্রুত।

তোমার শয্যায় রে বন্ধু পাইত্যা দিবাম্ বুক।

লোকসকল, আর তো বাইরে আমরা থাকতে পারি না। অন্দরে যাই। অন্দরে ফুলের বাগান, সে বাগানে আর কেউ নাই। আছে চাঁদ সুলতানা, আর আছে, কে আছে? তাও কি বলে দিতে হবে? আছে মনসুর বয়াতি, হাতে নিয়ে ঢাকাই সে শাল, রঙিলা দাসীর হাতে পাঠানো সে শাল।

মানুষ যখন আসে সমুখে তখন কি মানুষের মুখ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে? বিশেষ যে মানুষের জন্যে এত ফুল ফুটে থাকে?

বাগানের পাছদুয়ার দিয়ে মনসুর আসতেই চাঁদ ছুটে আসে।

ফোয়ারার পাখির মতো জল করে ওড়াউড়ি, ভিজে যায় চাঁদের বসন।

ভেজা মন ক'জন না দেখে?

চাঁদ বলে, লাজ ভুলে, বয়াতির হাত ধরে, এসেছ, এসেছ তুমি, বয়াতি? বাঁদির মুখে আমি শুনেছি তুমি আসবে। তোমার কথা আছে। তোমার কী কথা আছে, বয়াতি? এখানে দ্যাখো, এই ফুলা বাগানে আর কেউ নাই। তুমি তোমার সব কথা খুলে বলতে পার এখানে। তুমি রোজ আসতে পার। রোজ আমি এখানে আসি। বলো, কথা বলো, বয়াতি।

হটাৎ হাতের শাল চোখে পড়ে চাঁদ সুলতানার। শালখানা বাড়িয়ে ধরে আছে বয়াতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মনসুর।

চমকে ওঠে চাঁদ।

দ্রুত হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে বলে, কী? তোমার পছন্দ হয়নি?

ঠাটা পড়ে মানুষের উচ্চারিত বাক্যে।

এটা ফিরে নিতে হবে।

ফিরে নিতে?

ফিরে নিতে। আমি রাখতে পারি না যে।

জমিদারের বোন চাঁদ। বারো ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়ার কন্যা চাঁদ সুলতানা। আগুনরাঙা হয়ে ওঠে তার মুখ। বলে আমাকে তবে অপমান করতে এসেছ, বয়াতি? জানো, আমি যদি ইশারা করি, এই মুহূর্তে সিংহাসন ছেড়ে ছুটে আসবে আমার ভাই? আমি যদি চোখের পানি ফেলি, চোখের পলকে শত শত পাইক এসে তোমাকে কয়েদ করবে।

চোখে আসে পানি।

চাঁদ সুলতানার চোখে আসে পানি।

হায় পানি! এখনই কি জানা যাবে, যায়? আরো কতপানি।

আ, এই পানি, পানি যায়, ভেসে যায় দরিয়ায়, পানি, এই পানি কি গাঙের পানি, ও যে চক্ষেরই পানি রে।

মুখ ফিরিয়ে চাঁদ কান্নাভেজা গলায় বলে, তার আগেই তুমি চলে যাও, বয়াতি। আমার সমুখ থেকে চলে যাও। এই পুরী থেকে চলে যাও তুমি।

যাব। তবে যাই। যাই যাই, তবু যেতে পারি না তো। যতক্ষণ না এই উপহার যে হাত পাঠিয়েছিল তার হাতে তুলে দিয়ে যাই।

একবার দিলে আর ফিরে নেয়া নাই।

নিতে যে হবেই। না নিলে আমারই তো অপমান।

নতুন এ কথায় ফিরে তাকায় চাঁদ। গভীর চোখে প্রাণের প্রশ্ন নিয়ে তাকায় সে বয়াতির দিকে।

এ কেমন কথা? অপমান? আমাকে বুঝিয়ে দাও, অপমান কিসে?

সরলা নারীকে তখন মনসুর বোঝাতে থাকে কোমলস্বরে। আর সেই স্বরে কিন্তু গোপন থাকে না পদ্ম, পদ্ম দল মেলে।

মনসুর বয়াতি বলে, তবে বলি, বিবি চাঁদ সুলতানা। আমি বয়াতি। বয়াতিদের একটা নিয়ম আছে—সব নিতে আছে, শুধু চাঁদর কখনো নিতে নাই, নিয়ম নাই।

কেন? এ তো বড় অদ্ভুত নিয়ম।

মনে হতে পারে অদ্ভুত। সব শুনলে কিন্তু আর অদ্ভুত মনে হবে না, কন্যা। আর তখন ওই চোখের পানিও আর থাকবে না।

সোনার আঁচল দিয়ে চোখের পানি মুছে চাঁদ বলে, বেশ, আমি হাসছি। তুমি বলো, বয়াতি কেন সব নিতে পারে, চাদর নিতে পারে না?

পারে না, সে পারে না, এই কারণে পারে না, কন্যা—চাদর তাকে জয় করে নিতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চাদর সে নিতে পারে—আরেকজনের গলার চাদর, তাকে গানে গানে হারিয়ে দিয়ে। জয় করে নিলেই চাদর নিতে পারি আমরা, এই আমাদের রীতি।

চোখের পলক পড়বার আগেই চাঁদ বলে ওঠে, বেশ, তুমি জয় করেই নাও তাহলে। তখন তো নিতে পারবে? আমাকে গানে গানে হারিয়ে দিয়ে। দাও পাল্লা। অবাক হয়ে মনসুর বয়াতি প্রশ্ন করে, কার সঙ্গে?

কেন? আমার সঙ্গে। আমি গাইতে জানি। পদ রচনাও করতে জানি। জানি না সে কেমন জানি, কিছুটা তো জানি, এই আমি নিশ্চয় করে জানি।

মানুষের এই এক ভয়—রাজভয়।

রাজভয়ে মানুষ হয়ে যায় মরার আগেই লাশ।

মনসুরের ভয় করে, রাজবাড়ির বাগানে রাজকন্যার সঙ্গে পাল্লা দেবে গানে?

কিন্তু মানুষ কতখানি জানে যে অভয় তাকে দেবার মানুষও এই জগতে আছে, নইলে জগৎ কবেই তার মাতাসূর্যের কোলে ফিরে গিয়ে ভস্ম হয়ে আকশের শূন্যতায় ছড়িয়ে পড়ত।

চাঁদ বলে, এই বাগানে তুমি আর আমি। ভয় করো না, বয়াতি। বারো ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়ার কন্যা আমি। হাজার মানুষের সমুখে যেমন গাও, আজ তুমি গাও। কেউ তোমাকে কয়েদ করবে না।

তবু চুপ করে থাকে মনসুর। ভয় যায় না মন থেকে।

মহব্বত জঙের শূল আর চাবুকের কথা, হাতির পায়ের তলায় প্রজা পিষে মারবার কথা ব্রহ্মপুত্রের দুই পাড়ে এই দেশে কে না জানে?

চোখে নাচন তুলে চাঁদ বলে, কী? দাও পাল্লা।

রাজভয় কি সহজে যায়? মনসুর বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে হঠাৎ বলে, না, পুরুষ হলে দিতাম।

আর আমি নারী, তাই পাল্লা দিতে পার না, বয়াতি?

তাই।

তবে নারীকে তুমি পুরুষের সমান মনে কর না, বয়াতি।

চুপ করে থাকে মনসুর বয়াতি।

তখন, হে লোকসকল, চাঁদ সুলতানা মুখে মুখে পদ রচনা করে গেয়ে ওঠে,

‘পুরুষ মানুষ হইছ তুমি, কিসের গরব কর?
আইজ নারীর কথার জবাব দিতে নাহি পার।
ও দিতে নাহি পার।’

পদ টানে পদ, সুরের টানে আসে সুর। সুর এক এমন জ্যোৎস্না কেটে যায় সকল আঁধার। মনসুর গেয়ে ওঠে,

‘জবাব আমার জানা আছে, জবাব দেব না।
নারীর সাথে পাল্লা দিতে ওস্তাদের মানা।
ও ওস্তাদের মানা।’

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাঁধ ভেঙে যায় পাথরচাপা ঝরনার। চাপান-উতর চলে চাঁদ আর মনসুর বয়াতির।
চাঁদ গায়,

'ওস্তাদেরে ডাইকা আন, নিজে জানো না?
এক নারীর গর্ভে জন্ম তোমার, এক নারী তোমার মা।
তুমি কথায় পারবা না।'

মনসুর গায়,

'সত্য কথা কইছ তুমি, মিথ্যা কিছু না।
এই কথাতে তোমার সাথে বিবাদ করব না।
আমি বিবাদ করব না।'

'না-না-না, আমি এত অল্পে ছাড়ব না।
এত সোজা কথায় আমি হারতে দেব না।
আমি হারতে দেব না।'

'এই বিপদে পড়ব আমি, আগে জানতাম না।
জিততে পারি জবাব দিয়ে, জিততে চাই না।
আমি জবাব দেব না।'

'জবাব তুমি দিবা কী হে, জবাব জানোই না।
কও, নারীর সাথে পাল্লা তুমি কেন দিবা না।
তমি কেন দিবা না?'

'দ্যাখো তুমি এমন-তেমন খোঁচা দিও না।
খেপলে পরে আমার কিন্তু হুঁশ থাকে না।
ও হুঁশ থাকে না।'

তখন খিলখিল করে হেসে ওঠে চাঁদ। সুর ছেড়ে পদ্যে এবার কথা কয়ে ওঠে মনসুর।

'শোন তবে, শোন বিবি চাঁদ সুলতানা।
নারীর সাথে পাল্লা দিতে ওস্তাদের হয় কেন মানা?'

'বলো না?'

'নারীর দুইরূপ আছে, ভেবে তুমি দ্যাখো তো আপনি।
নারী যে জননী হয়, আর নারী যে ঘরনী।'

'বেশ কথা। তারপর?'

'জননীরে মাথায় রাখি, ঘরনীরে বুকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নারী নিত্য সঙ্গে থাকে পুরুষের দুঃখে আর সুখে।'

'আচ্ছা?'

'নারী যে আদরের বস্তু, নারী যে রতন,
নারী হেন বন্ধু নাই জগতে এমন।'

'তা না হয় হলো।'

'তাই, বন্ধু যদি হয় নারী, এত বড় বন্ধু যদি হয়,
সেই বন্ধুর সাথে পাল্লা দেওয়া উচিত নাহি হয়।'

চাঁদ সুলতানা তখন সমাজের লাজ ভুলে মনসুর বয়াতির হাত দুটি ধরে। বলে,
'এই যদি নিজমুখে করিলা স্বীকার,
বন্ধু বলে ঠাঁই দিও পরানে তোমার।
বন্ধু ভেবে নিও বন্ধু এই উপহার।
তুমি যে আমার বন্ধু, আমি যে তোমার।'

লোকসকল, এত বলে চাঁদ সুলতানা এবার কী করে? এই করে, ফুল চয়ন করে সে মালা রচনা করে।

ফুলের গন্ধে ম' ম' করে ওঠে দিগ্বিদিক।

এ জীবন হয়ে যায় বিশাল এক বিল; শুধু কাঁদে ব্রহ্মপুত্র নদ, তাকে কত পানি, এই পানি, চক্ষের পানি কত বহে নিয়ে যেতে হবে দূরে, কতদূরে, দরিয়ায়, আহা।

চাঁদ সুলতানার হাত সরিয়ে মনসুর গেয়ে ওঠে,
'শোন কন্যা, শোনা বিবি চাঁদ সুলতানা,
জমিদারের ভগ্নি তুমি, জমিদারের ঝি।
আমি তো চাষীর ছেলে, ভাই আমার চাষী,
তুমি কেন আমার জন্য হইবা দিওয়ানা?'

মালা গাঁথে আর উত্তর দেয় চাঁদ,

'তুমি কবি—এই জানি, গরিব জানি না।
দিওয়ানা হইলাম কেন, তুমি বোঝ না?
মানুষের মনের খবর এত তুমি রাখ,
এত জানো, নারীর হিয়া তুমি জানো না?'
মনসুর বয়াতির মনজুড়ে কালবৈশাখীর মেঘ ধেয়ে আসে। সে বলে,
'কী জানি, আমি কী জানি না, জানি এই সত্য ভীষণ—
সোনার মোহরের নদী, দুই পাড়ে আমরা দুইজন।
মানুষ সৃষ্টি করেছেন আল্লা এক মাপে এক ভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মানুষের এমন কুমতি—মানুষ তা খণ্ডাবে।
মানুষ নিজেই দূরে মানুষকে রাখে তার মিথ্যা গৌরবে।
এমন সংসারে কন্যা ভালোবাসা অসম্ভব হবে—
সত্য বলি, শোন শোন, চাঁদ সুলতানা।'

মালা গাঁথা ফুরিয়ে আসে। মালার ফুলে ফুলে চাঁদের মন গাঁথা হয়ে থাকে।

মালায় শেষ ফুলটি পরিয়ে দুই সুতার মিলন করে বাঁধন দিতে দিতে চাঁদ বলে,

'তুমি কবি এই সত্য, আর কিছুই জানি না।
মানুষেরই মন সত্য, তা কি বোঝ না?
সোনারূপা ধুলামাটির মন যদি মন খুঁজে পায়।
মানুষের সাধ্য নাই সেই মন আলাদা করায়।
আমি যে জীবনভর আছিলাম, এই অপেক্ষায়,
নিজ হাতে মালা গেঁথে পরাব তোমায়।
তুমি কি আমার মালা গলায় নিবা না?'

এত বলে চাঁদ সুলতানা মনসুর বয়াতির গলায় মালা পরাতে যায়, সে হাত ফেরাতে ফেরাতে মনসুর বলে ওঠে,

'মালা পরাইও না বিবি চাঁদ সুলতানা।
আসমানেতে আছ তুমি পূর্ণিমারই চান,
ধুলামাটির উঠানেতে নামতে চাইও না।'

হাতের মালা হাতে থেকে যায়। চোখের জলে ভেসে চাঁদ শুধু বলে, তবে আমার এই মালাও তুমি নেবে না, মনসুর? বারবার তুমি আমার সব উপহার ফিরিয়ে দেবে? তুমি আমাকে জয় করে নিয়েছ, বয়াতি, আমাকে তুমি একবারও দেবে না তোমাকে জয় করে নিতে?

এত বলে আবার মালা নিয়ে মনসুরের গলায় দিতে যায় চাঁদ। এমনই তো হয়, ঠাটা পড়ে পরিষ্কার নীল আকাশে। চিৎকার শোনা যায় মহব্বত জঙের, কুত্তাটাকে কয়েদ কর।

শত পাইক এসে ঘিরে ধরে মনসুরকে।

অজ্ঞান আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে যায় চাঁদ।

এ চাঁদ মানুষ বলেই শতখান হয় না।

আগে তো অবলার পরান বধের ভাগী হও।

মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে চাঁদ সুলতানা। মহব্বত জঙ সেই জমিদার যার হাতির পায়ের নিচে প্রাণ দিয়েছে কত প্রজা। প্রজা হয় রাজার সন্তান, হাঁ, সে-সকল মুখের কথা।

নিজের রক্ত যে স্বজনের শরীরে বয়, তার জন্যে রাজার ক্রোধ হাতির আকার ধারণ করে না, লোকসকল। সে ক্রোধ হয় নিরাকার, তবে পর্বতের চেয়েও তার ভীষণ আকার।

চাবুক হাতে মহব্বত জঙ মেঝের 'পরে সপাং সপ আঘাত হানেন। ভয়ে থরথর করে কাঁপে নূরজাহান। কখন বুঝি ননদিনীর অঙ্গে পড়ে শংকর মাছের লেজে তৈরি চাবুক। যদি পড়ে, শরীরের সেই স্থানে মাংস গলে খুলে যাবে, হায়!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চিৎকারে—মহব্বত জঙের চিৎকারে জগতের সবকিছু আগেপাছে হয়ে যায়।

আজ তোকে আমি শেষ করে ফেলতাম। তোর নাম চিহ্ন চেহারা আমি দুনিয়া থেকে মুছে দিতাম যদি না তুই আমার মায়ের পেটের একমাত্র বোন হতি, যদি না এক রক্ত আমাদের দুজনের শরীরে থাকত। যদি না আমার কন্যার মতো তোকে দেখতাম, এই চাবুক তোর পিঠে না পড়ে এই মেঝেতে পড়ত না। তবে তোকে রেহাই দিলেও তাকে আমি রেহাই দেব না।

মূর্ছার ভেতরেও মানুষ কিছু শোনে, শোনে সে যা তার জীবনের মূল ধরে টান দেয়। চাঁদ চমকে ওঠে।

ভাইয়ের পায়ের কাছে গড়িয়ে এসে বিনতি করে চাঁদ বলে, না, না, তার চেয়ে তুমি আমাকে কাট, আমাকে মার, পাগলা হাতির মুখে তুমি আমাকে ঠেলে দাও, ভাইজান। নদীর জলে আমাকে কেটে ভাসিয়ে দাও।

লোকসকল, কয়েদখানায় প্রবেশ করতে কেঁপে ওঠে প্রাণ।

মনসুর বয়াতি সেখানে মেঝেতে শয়ান।

ভীমের আকৃতি দুই বরকন্দাজ, বুঝি তাকে শেষ করে আজ।

হাত ভাঙা, পা ভাঙা, মুখে রক্ত কষ। পিঠের ওপরে তার অবিরাম লগুড়ের বাড়ি আর চাবুকের আছাড়।

ভেঙে পড়ে নদীর কাছাড়।

ব্রহ্মপুত্র জল লয়ে থমথম করে।

এই জল লয়ে যাবে দূরান্তে সাগরে।

মহব্বত জঙ প্রবেশ করেন।

মরে নাই? এখনো সে মরে নাই? কুত্তাটাকে শেষ কর নাই?

নায়েব মাথা নত করে বলে, সে-রকম আদেশ তো পাইনি, হুজুর।

আদেশ? এত বছর আমার নায়েবি তুমি কর, এখনো ইশারা বোঝ না? আদেশের অপেক্ষা কর?

নায়েব হাত কচলে বলে, আদেশের অপেক্ষা করব কেন, হুজুর? গোলাম অপেক্ষা করছি আপনার জন্যে আপনি একটু এদিকে আসুন।

তার অন্তরালে, কানে কানে, নায়েব বলে মহব্বত জঙকে, কাজটা কি ঠিক হবে, হুজুর? একেবারে প্রাণে মেরে ফেলা? জানেন তো, এ দেশে মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ কি ভুঁইয়ারা করেছে? করেছে প্রজারা? প্রজা শক্তি, প্রজা বল। আর এই প্রজা সকলের কাছে মনসুর বয়াতির বড় খাতির, বড় নাম, বড় মান। তাকে তারা বুকের মধ্যে রাখে। প্রাণে শেষ করে দিলে যদি প্রজা ক্ষেপে ওঠে?

আহ্, চুপ কর।

ভেবে দেখুন, হুজুর। গত দুই সন খরা। ফসল হয় নাই। খাজনা চাইতে গেলে মানুষ আগে বনের মধ্যে গিয়ে লুকাত। এখন পাইক পেয়াদার পরোয়া করে না। বুক টান করে সামনে এসে দাঁড়ায় আর চোখ রক্তবর্ণ করে বলে, কিসের খাজনা, কিসের বাজনা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শ্মশানযাত্রার বাজনা বাজায়া দিবাম আবার যদি আইসুন।

পরিস্থিতিটা মহব্বত জঙ জানেন না তা নয়। কিছুক্ষণ থম্ মেরে থেকে তিনি বলেন, আমি আর স্থির থাকতে পারছি না, নায়েব। আমার মান, আমার মর্যাদা। কিছু একটা কর তবে, কিছু একটা কর।

তাই করছি, হুজুর। তারই আদেশের অপেক্ষায় আমি আছি।—গান। ওর গানের জন্যেই তো সব? গান দিয়েই তো চাঁদবিবির মন ভুলিয়েছে? সেই গান এবার আমি ওকে ভুলিয়ে দেব।

কীভাবে?

মহব্বত জঙের কানের কাছে আরো সরে এসে, নায়েব ফিস ফিস করে বলে, বিষ দিয়ে।

বিষ?

এ বিষ সে বিষ নয়, হুজুর। এ বিষ প্রাণ হরণেরও নয়। এ বিষ গান হরণের। গান তো গান, গলা দিয়ে স্বর পর্যন্ত ফুটবে না, কথা বলতে পারবে না। চিরদিনের মতো বোবা হয়ে যাবে।

আশার আলো একজন দ্যাখে, অন্ধকার দ্যাখে সর্বলোকে।

মহব্বত জঙ উত্তেজনায় চেঁচিয়ে ওঠেন, কোথায় সে বিষ? এক্ষুনি, এক্ষুনি, এক্ষুনি। ধীরে, হুজুর, ধীরে। বিষটা দিতে হয় মেঠাইয়ের সঙ্গে। আর, সে মেঠাই নিজের ইচ্ছায় হারামজাদা যদি খায়, তাহলে কোনো ঝামেলা থাকে না। যদি অভয় দ্যান তো একটা কথা বলি।

লোকসকল, কয়েদখানার এই বিষ-ষড়যন্ত্র থেকে আবার যাই অন্দরে। চাঁদ এখন উঠে বসেছে মেঝের ওপর, লুটিয়ে আছে তার কালো কেশের ভার, যেন তার জীবনের অন্ধকার।

আঘাতের পর সবকিছু হয় পাথর, সেই পাথর গলায় চাঁদ বলছে নূরজাহানকে, ভাবি, তার জীবন কি এখনো আছে?

পানি নেই চাঁদের চোখে, চাঁদের প্রাণের সব পানি ঝরে এখন নূরজাহানের চোখে। সে বলে, বুবু লো, এই পাষাণপুরী রাজবাড়ির ওই কয়েদখানার কথা শুনলে বুক কাঁপে। শত বছরে ওখান থেকে জীবিত কেউ বেরিয়ে আসেনি। ওখানে যে যায়, সে আর ফেরে না।

ঘরের ভেতরে মহব্বত জঙ এসে দাঁড়ান। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন তিনি চাঁদ সুলতানার দিকে। স্তব্ধতার শিলাবৃষ্টিতে ভরে যায় ঘর।

চাঁদ প্রশ্ন করে শান্ত সমাহিত গলায়, সে তবে জীবিত নেই?

কিছুক্ষণ আরো শিলাবৃষ্টি হয়।

মহব্বত জঙ তারপর সংক্ষেপে শুধু বলেন, আছে।

বিশ্বাস কি বাক্যে কখনো হয়? প্রতিধ্বনির মতো চাঁদ উচ্চারণ করে, আছে?

নূরজাহান স্বামীর দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। এও কি সম্ভব? অত্যাচারী এই রাজা কি বাঁচিয়ে রেখেছে বয়াতিকে?

চাঁদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ধীর, অতি ধীর গলায় মহব্বত জঙ বলেন, হ্যাঁ, সে জীবিত আছে। চাঁদ, আমি তাকে জীবিত রেখেছি। আর, দেড়শো বছরের মধ্যে এই প্রথম আমি এই বংশে একজন, ওই কয়েদখানা থেকে জীবিত কাউকে বাইরে যেতে দেব স্থির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করেছি।

হতভম্ব নূরজাহান। এ কোন মহব্বত জঙ? ব্যাকুল হয়ে সে বলে ওঠে, আপনি তাকে মুক্তি দেবেন?

মহব্বত জঙ মৃদু হাসেন, বলেন, কেন? বেগমের কি বিশ্বাস হচ্ছে না? অন্দরমহলের তোমাদের কারো কয়েদখানায় পা দেবার নিয়ম নেই বলে, তোমরা চোখে দেখে যাচাই করতে পারবে না বলে, মনে করেছ আমি তার প্রাণদণ্ড দিয়ে এসে তোমাদের ভোলাবার জন্যে এ কথা বলছি?

এইমতো লোকে বলে, প্রান্তরে দেখেছে তারা—পতিত কোনো বৃক্ষও ফের উঠে পড়ে যদি এক পরী-পূর্ণিমার আলো তার পত্রে এসে পড়ে।

চাঁদ উঠে দাঁড়ায়। তার শান্তকণ্ঠে লাগে ঝড়ের দোলা। সে বলে, বেঁচে আছে, বেঁছে আছে তবে?

মহব্বত জঙ বলে, তবে যা, চাঁদ, তুই নিজে গিয়ে নিজ হাতে তাকে মুক্তি দিয়ে আয়। আমি অনুমতি দিলাম। আমার পূর্বপুরুষের সকল নিয়ম ভঙ্গ করে আমি তাকে অনুমতি দিচ্ছি, যা, তাকে মুক্তি দে তুই তোর নিজের হাতে। অনুমতি দিলাম, নিজ হাতে তাকে তুই সদরের তোরণ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আয়।

ছুটে বেরিয়ে যায় চাঁদ, যেন একটা তীর মুক্ত হয় ধনু থেকে।

কয়েদখানার দরোজা খুলে সরে দাঁড়ায় প্রহরীরা। ভেতরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে মনসুর বয়াতি। চেতন আছে কী নাই। চাঁদের পায়ের শব্দ, প্রেমের পায়ের শব্দে প্রেমিকেরও শব নড়ে ওঠে, লোকেরা এমত বলে।

বুকে করে তোলে তাকে চাঁদ। বলে, আমি তোমাকে মুক্তি দিতে এসেছি, বয়াতি। দ্যাখো, আমি তোমার সব বাঁধন খুলে দিয়েছি। তুমি দ্যাখো, আমি তোমাকে আমারই হাতের বাঁধনে এখন রেখেছি। আর কোনো ভয় নেই। আর আমাদের কোনো ভয় নেই। রাজভয়, লোকভয়, সকল ভয়। চলো তুমি, এসো তুমি, আমার দু'হাত ধরে এ পাষাণপুরী থেকে চলো তুমি।

চলতে কি পারে মনসুর? বারে বারে পড়ে যায়। বারে বারে ঢলে পড়ে বিবি চাঁদ সুলতানার বুকে।

নায়েব এসে বলে, হাঁটতে কি পারে? কাল থেকে এ পর্যন্ত দানাপানি পড়েনি পেটে।

নায়েবের পাশেই এসে নীরবে দাঁড়িয়েছিল ভীমের আকৃতি এক গোলাম। তার হাতে রুপার খাঞ্চায় পানি, রুপার গেলাসে পানি, শীতল ও মসলিনের রুমালঢাকা, রুপার তশতরিতে চাঁদির তবক দেয়া দুধের মেঠাই।

নায়েবের ইঙ্গিতে খাঞ্চা এনে ধরে সে গোলাম। চাঁদ তুলে নেয় গেলাস। মনসুরের মুখে দেয় পানি। এক ঢোক, দুই ঢোক, তারপর ঠোঁট বেড়ে গড়িয়ে পড়ে পানি। বমির ধমকে কেঁপে ওঠে শরীর।

চাঁদ কি জানবে কতখানি গেছে এই শরীরের ওপর দিয়ে তার?

নায়েব বলে, অনাহারে পেটে পানি সহ্য হবে কেন? একটু কিছু পেটে না পড়লে চলতে পারবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ব্যাকুল হয়ে চাঁদ একটা মেঠাই তুলে নেয় খাঞ্চা থেকে। মনসুরের মুখে ধরে বলে, খাও, একটু খাও, আমি তোমাকে নিজের হাতে খাইয়ে দিচ্ছি। বল পাবে। তুমি বল না পেলে আমি অবলা বল পাব কোথায়, বয়াতি?

একটু একটু করে মেঠাই ভেঙে সবটা খাইয়ে দেয় চাঁদ তাকে নিজ হাতে। তারপর তাকে নিয়ে কয়েদখানা থেকে বেরোয়।

নায়েব তাড়াতাড়ি চাঁদের পথে বাধা দিয়ে বলে, বিবি, বাইরে সব পাইক পেয়াদা কাছারির মানুষ। বারো ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়ার কন্যা আপনি, বাইরে গেলে সে মোটে ভালো দেখাবে না। এত বলেই নায়েব প্রহরীদের হুকুম দেয়, এই কে আছিস? খুব খাতিরের সঙ্গে খুব যত্ন করে বয়াতিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আয় তো, বাপ।

চাঁদের পা থমকে যায়।

রীতি বলো রীতি, নিয়ম বলো নিয়ম। সু হোক কু হোক, নিয়মের শেকল বড় শেকল। মনসুরের হাত ছেড়ে দেয় চাঁদ। মনুসরকে নিয়ে চলে যায় প্রহরীরা।

লোকসকল, বিষ কত রূপ নেয়, বিষও মেঠাই হয়ে জঠরে যায়, জঠর সে বিষ ধরে, তারপরে রক্তের ধারায় পাঠায়। মনসুরের স্বর বন্ধ হয়ে যায়।

হায়দার, মিয়াভাই তার, বাপের আদরে যাকে করেছে মানুষ, সন্তানের অধিক জ্ঞানে পালন করেছে যাকে সেই ভাইটির রক্তাক্ত শরীর আর বোবাস্বর দেখে—কী করে? সে কী করে? এক কোপে কাটা বৃক্ষ পড়ে যায়। তারপর, কারবালার জঙ্গে ইমামের বংশ শেষ হলে যেমন মহাবীর আবু হানিফা, সেই হানিফার মতো এক চিৎকার দিয়ে ওঠে হায়দার। প্রহরীদের ওপর সে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধারালো শানানো এক দাও নিয়ে। আজ হবে এ জগৎ শেষ। কিন্তু তার আগেই বল্লমের ফলা তার বুক ভেদ করে চলে যায়।

বেজে ওঠে ঢাকঢোল শিঙা ও সানাই।

সেই যে রঙিলা রাজা, কেষ্টরাজা কেউ কেউ বলে, সেই ফিরোজ দেওয়ান আসে স্বর্ণসাজে ঘোড়ায় সোয়ার। বরযাত্রী পাছে পাছে। কত রঙ্গ কত নৃত্য কত বাদ্য শত শত মানুষের ঢল।

বিবাহের বাদ্যে ডুবে যায় হায়দারের মরণ-চিৎকার।

বিবাহের সাতরঙা আবীরে বিলীন হয়ে হায়দারের তাজা রক্ত।

সেই রক্ত আর কে বা নেয়? মাটি নেয়।

মাটি তার সব রক্ত নিয়ে কালো বর্ণ হয়ে যায়।

মাটির ওপর দিয়ে ফিরোজের শ্বেতবর্ণ ঘোড়া চলে যায়।

মহব্বত জঙের সাতমহলের তোরণের নিচে এসে ঘোড়া স্থির হয়। তুমুল সে বেজে ওঠে বাদ্যভাণ্ড। ফিরোজের বরযাত্রী অনুগামী লাল ফেটা বাঁধা শত লাঠিয়াল নৃত্য করে। হুংকার দেয় তারা, আয়, আয়, আইসাছি রে, কন্যা লইয়া যাইবাম ফিরোজ শাহাব।

রীতি বলো, রীতি, বিবাহের এই রীতি, বরযাত্রী আর কন্যাপক্ষ এই দুই পক্ষের দুই লাঠিয়াল দল করবে নকল যুদ্ধের খেলা, তারপরে কন্যাপক্ষ পরাজয় মানবে নকল, সেই দণ্ডে সাদরে বরণ করে নেয়া হবে বর। রোশনাই হয়ে উঠবে সদর অন্দর। পাত পড়বে হাজার হাজার। তিন দিনের আহার তারা করবে আজ বসে থাকে থাকে। মৌলবি কলেমা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পড়ে তুলে দেবে দামান্দের হাতে কবিলাকে।

লাঠিয়াল যুদ্ধ করে দুইপক্ষে, কিন্তু যারা সেই যুদ্ধ দ্যাখে তারা তো দেয় না তালি। মহব্বত জঙের ভগ্নি, বিবাহ যে তার, কত সুখের ও আনন্দের এই সমাচার।

তবু তার প্রজা কেন এমন বিমর্ষ আজ?

কেন তারা বলে না 'সাবাস'?

কেন সর্বলোক দূরে দূরে?

লোকসকল, মহব্বত জঙের সব প্রজা থাকে দূরে ধুরে। তারা সব চোখের পানি মোছে আর বলে—

'মনসুর বয়াতি, হায়, বোবা হয়ে গেছে।'

'কথা বন্ধ হয়ে গেছে তার।'

'আহা, সেই স্বর।'

'আহা, সেই সুর।'

'সাক্ষী আছে জৈন্তা পাহাড়, এমন বয়াতি আর হয় নাই শতবর্ষে, কণ্ঠ নাই তার?'

'বোবা হয়ে গেছে সে হঠাৎ, এ কেমন আল্লার বিচার?'

'বোবা, বোবা, বোবা।'

'তারে কিবান খাওয়াইছে কেবা।'

লোকসকল, অন্দরে এখন যাই।

আমাদের আগেই এই সংবাদ যায়, কিবান খাওয়াইছে কেবা, মনসুর বয়াতি আজ হইয়া গেছে বোবা।

আকাশ চিরে চিৎকার করে ওঠে চাঁদ।

এ আমি কী করলাম, হায়! আমার নিজের হাতে কিবান তারে খাওয়াইলাম আমি।

সেই চিৎকার রাজবাড়ির প্রাচীর পার হয়ে প্রান্তর পার হয়ে জগৎ পার হয়ে নক্ষত্রের ভেতরে ছড়ায়। নক্ষত্রসকলের চোখে তাই আজও অবিরাম জলপলক পড়ে, তারা টিমটিম টিপটিপ ঝিমঝিম করে। ব্রহ্মপুত্রের পাড়ে আজও, লোকসকল, গভীর রাতে নক্ষত্রের দিকে চেয়ে দেখুন—জল ভরভর চোখে তাদের অবিরত পলক পড়ে।

মহব্বতের প্রজাসকল দাফন করে হায়দারের লাশ। আর অচেতন মনসুরের পাশে বসে আবুল যে শিষ্য তার আকাশের দিকে দুই হাত তোলে। কণ্ঠে তার ভর করে বিদ্যাবতী। ভাষা ভর করে ঝলসে প্রশ্নের বিদ্যুৎ। বৃষ্টি পড়ে সারিন্দার সুরের মতো কেঁদে কেঁদে। প্রশ্নের উত্তর তার জানা নেই।

মনসুরের অচেতন দেহ সাক্ষী রেখে আবুল রচনা করে চষামাটি মাথা লক্ষ মানুষেরই অন্তরের পদ।

'তোমার দরবারে আল্লা মানুষের এই প্রশ্ন, এই নিবেদন—

যদি তুমি মানুষ সৃষ্টি করেছিলে, কেন তাকে দিয়াছিলে মন?

মন যদি দিয়াছিলে, তবে সেই মনে কেন দিয়াছিলে আশা?

আশা যদি দিয়াছিলে, কেন তবে দিলা হে নিরাশা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যদি সৃষ্টি করেছিলা কোমল কুসুম,
তবে সেই কুসুমে দিয়াছ কেন এত বিষকাঁটা?
কেন কারো মনে সুধা, কারো মনে দিলা তুমি বিষ?
এত বিষ, তুচ্ছ যার কাছে সর্পবিষ।
হারে, মানুষের অন্তর ভরা আছে সেই বিষে,
সেই বিষ ক্ষয় হবে, বারিতাল্লা, কিসে?'

মহব্বত জঙের অন্দর মহলে তখন চাঁদ সুলতানা হায় হায় করে ওঠে, বোবা করলাম বনের পাখি নিজের কোলে নিয়া? কী আর করবাম আমি এই জীবন লয়া? মতি বাঁদির হাত ধরে অনুনয় করে চাঁদ, কিসের ঢোল, কিসের ডগর, আমারে দাও কইয়া। আমি যে গেলাম আইজ সর্বস্বান্ত হইয়া। তুমি তো সকলই জানো, আমার সাথী তুমি। আমারে নি আইনা দিতে পার বিষ, বিষ খাইবাম আমি।

চিৎকার করে ওঠেন মহব্বত জঙ, কী? বিষ খাবে? ফিরোজ দেওয়ানের মতো দেওয়ান, সূর্যের মতো উজাল তার দরবার, তার সঙ্গে বিয়া করলাম ঠিক, সেই তাকে পছন্দ নয় তার? ওই এক গরিব চাষা, ভাষার কারিগর, কারুকর্ম তার—মূল্য নাই এক পয়সার, তার জন্যেই জীবন দেবে ভগ্নি আমার?

নূরজাহান বলে, এই বিয়ে স্থির করার আগে একবার কি দরকার ছিল না জিজ্ঞাসার?

কাকে জিজ্ঞাসা? কিসের জিজ্ঞাসা? ফিরোজ দেওয়ান বরযাত্রী নিয়ে এসেছে। ফিরে যাবে? রাজ্যের লোক হা হা করে হাসবে? মোগলের ফৌজদার ঠাট্টা করে পত্র পাঠাবে—নিজের ভগ্নিকে যে পারে না করতে শাসন, আকবর শাহার সাথে কোন বলে করে সে স্বাধীন রাজার মতো আচরণ? না, বেগম, না। বিয়ে করবে না, বিষ খাবে? তবে আমিই তাকে নিজের হাতে বিষ দেব।

তাঁর পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে নূরজাহান।

হায়, কুমতি অমতি লোক কী বা কার্য করে।

অঙ্গে যার অঙ্গ রেখে স্বর্ণ জ্ঞান করে, মহব্বত জঙ আজ তাকেই এক লাথি মারেন। বলেন, সর্ পথ থেকে।

অচিরেই চাঁদের ঘরে আসে মহব্বত। নিজ হাতে রুপার গেলাস ভগ্নিকে দিয়ে তিনি বলেন, তাহলে বিষই খাবি? এই নে বিষ। এই দিলাম বিষ। এই বলে সে তার কোমরবন্ধে রাখা এক জেব থেকে বের করে শিশি। গেলাসে উপুড় করে ঢেলে দেয় শিশির সবটুকু গুঁড়ো।

আবার পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে নূরজাহান।

চাঁদ সে গেলাস তোলে ঠোঁটের কাছে।

নূরজাহান উন্মাদের মতো চিৎকার করে ছিনিয়ে নিতে যায় গেলাস।

কিন্তু তার আগেই ঢকঢক করে সমস্তটা পান করে চাঁদ। পান করে ঢলে পড়ে যেন শেষরাত্রির চাঁদ।

স্বামীর আঙরাখা ধরে টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে নূরজাহান বলে, এ কী করলে, দেওয়ান?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নিজের বোনকে তুমি নিজ হাতে বিষ দিলে?

যে স্ত্রীকে ক্ষণেক আগেই লাথি মেরেছিলেন দেওয়ান মহব্বত জঙ, এখন তাকেই তিনি উপহার দেন হাসি। বলেন, না, বেগম, বিষ নয়, ঘুমের ওষুধ। আজ সারা রাতেও এ ঘুম তার ভাঙবে না। যাও, বিয়ের আয়োজন কর। এখন আর বিয়ের কোনো বাধা নেই। ফিরোজ দেওয়ান বসে আছে অনেকক্ষণ তার ঘোড়ার পিঠে।

তারপর অলিন্দে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে তিনি হুকুম দেন পাইক বরকন্দাজ প্রহরী আর হরকরাদের, জ্বালো রোশনাই, জ্বালো। বাজাও বাদ্য, বাজাও।

কোন দেশের থন্ আইছ তুমি কোন বা দেশে যাও?

লোকসকল, ব্রহ্মপুত্র বয়ে যায়, দূরে যায়, দরিয়ায়। লাশ হয়ে হায়দার ঘুমায়। মানুষের জীবন আর কতক্ষণ? চিরকালের জগতে সে পলকেরও ভগ্নাংশ পলক। এই ব্রহ্মপুত্র পাড়ে তার কবরের কাঁচা মাটির ওপর বোবা মনসুর বয়াতি লুটায়। লুটায় তার সারিন্দা আর লুটায় তার সাথের সাথী আবুল।

আবুল তুলে ধরে মনসুরকে। মিনতি করে বলে, আর কত মাটি ধরে কাঁদবে? চোখের পানিতে সাগর হয়ে যাবে। মাটি তো আর ফিরে দেবে না মানুষকে।

আবুলকে বুকে জড়িয়ে ধরে মনসুর। হু হু করে কান্নার দমকে তার শরীর কেঁপে ওঠে থরথর করে, কিন্তু নাই কোনো স্বর।

আবুল বলে, ওস্তাদ, তবে আর কিসের আশা? চলো, আমরা যাই।

আবুলকে ধরে পায়ের ওপর উঠে দাঁড়ায় মনসুর বয়াতি। কণ্ঠে তার স্বর নাই, সংসারে আপন যে সহোদর ভাই তার সেই ভাই আর নাই।

স্বর আর সহোদর দুই-ই তার নাই।

স্বরও সহোদর বটে। প্রেমের গর্ভেই তো জন্ম নেয় স্বর-ভাব। মনসুরের দু'চোখ বেয়ে অঝোর ধারে অশ্রু পড়ে। আবুলের কাঁধে হাত রেখে সে এখন হাঁটে। ব্রহ্মপুত্র জলভেজা মাটিতে পড়ে ক্রমাগত তার পায়ের ছাপ।

আবুল বলে, ওস্তাদ, তুমিই না একদিন বলেছিলে—পেছনে টান না থাকলে যেদিকে দু'চোখ যায় তুমি চলে যেতে? তোমার মিয়াভাই তো এখন আর নাই। তোমার চাঁদ তো আর আজ তোমার নাই। চলো যাই, দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে গান গাই। তোমার গলা নাই, আমার তো আছে। আমার এই গলা তো তোমারই দান। আমি তোমার পরানের কথা তোমারই সারিন্দার সুরে তোমার হয়ে জগৎকে শোনাব। চলো, ওস্তাদ। আমাদের জননীর পায়ে সেলাম রেখে এই অত্যাচারীর দেশ থেকে আমরা চলে যাই।

মনসুর নত হয়ে মাটি স্পর্শ করে। হাতে মাটি মাখে। সেই হাত কপালে সে রাখে। আবুল সারিন্দায় সুর তুলে কেঁদে ওঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

‘জননী জননী বলে, লোকে বলে যে জননী,
মাটিতে জন্ম রে এই মাটিই তো জননী।
জননী গো বিদায় দাও তোমার সন্তানে,
বুঝে নিও কত দুঃখ বোবার পরানে।’

আবুলের হাত থেকে সারিন্দাটা কেড়ে নেয় মনসুর। কণ্ঠ নাই, হাত তার এখনো তো আছে, সেই হাতে সারিন্দায় সে তোলে সুরের ঝংকার। পার হয়ে যায় তারা গ্রাম। গ্রামের পর গ্রাম। মনসুরের হাতে বাজে সারিন্দা, আবুলের কণ্ঠে ফোটে পদ।

‘পাখি বোবা, পশু বোবা, বোবা গাছের পাতা
তাহার অধিক বোবা করেছ বিধাতা।
কোন পাপে? তবে পাপ বুঝি ভালোবাসা?
তাই ঠাটা বজ্র পড়ে এই সর্বনাশা?
তোমারে ছাড়িয়া যাই বিদাশেতে মাগো,
দোয়া করো তুমি যেন অন্তরেতে থাকো।’

লোকসকল, আমরাও এই দেশ চেড়ে চলে যাই। ফিরোজ দেওয়ানের দেশে আমরা তার রাজ্যে যাই।

ফিরোজ দেওয়ানের রাজপুরীতে কতকাল পরে আজ আনন্দের রোশনাই।

লোকসকল, এতকাল একাকী বাঁশি বাজিয়েছেন ফিরোজ। শোনার ছিল না কেউ। আজ তাঁর শোনার মানুষ ঘরে এসেছে। আহা, পিতৃগৃহ ছেড়ে আসা কত শোকের গো। এ কি রীতি এই জনমের, জনম জনমের যে ঘর, নারীকেই সেই ঘর চিরকালের মতো ছেড়ে যেতে হয়, আর হতে হয় পর। কোন দেশ থেকে আসে মানুষ, কোন দেশে বা যায়—এ যদি হয় জন্ম আর মৃত্যুর কথা, ঘরভাঙা পথিকের ঘরসন্ধান কথা, আবার এও তো বটে নারীর পতিগৃহে যাত্রার কথা।

অজ্ঞান অচেতন চাঁদ শুয়ে আছে তার বাসরশয্যায়।

ফিরোজ দেওয়ান বৌ নিয়ে ফিরেছেন নিজে ঘোড়ার পিঠে, কন্যাকে রাজহংস পালকিতে তুলে। কন্যা ছিল অচেতন ঘুমে। এখানো এ বাসরশয্যায় সে অচেতন একই সেই ঘুমে। পিতৃগৃহ ছেড়ে আসবার কষ্টে বুঝি মুদিত হয়ে আছে এই পদ্ম। সেই পদ্মের ওপর পড়েছে পূর্ণিমার আলো।

মুগ্ধ হয়ে ফিরোজ দেওয়ান একবার আকাশের চাঁদ দেখেন, আরেকবার ধরণীর এই চাঁদ। আকাশের চাঁদ আছে জেগে। ধরণীর চাঁদ ঘোর ঘুমে।

আপনার মনে ফিরোজ বলেন, আমি কি স্বপ্ন দেখছি? আকাশের চাঁদ তবে সত্যি সত্যি নেমে এসেছে আমার ঘরে? চাঁদ, ও চাঁদ, আবার তুমি আকাশে ফিরে যাবে না তো?

যদি স্বপ্ন হয়, যদি হয় আকাশের চাঁদ, এই ধরণীর সে নয়, ফিরোজ অতি ধীরে হাত বাড়ান ওই মুখখানি স্পর্শ করে দেখবার জন্যে, সত্যিই কি ধরণীর?

পদ্মের পাপড়িতে আঙুল প্রায় ছোঁয় ছোঁয়, হঠাৎ আঙুল সরিয়ে নেন ফিরোজ দেওয়ান। আপনারই মনে বলে ওঠেন, না, চুরি করে তোমাকে স্পর্শ করব না। তুমি ঘুমাও, চাঁদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমি অপেক্ষা করব।

এত বলে দেওয়ান তাঁর মেজ থেকে তুলে নেন বাঁশি। বাসরের ঘর ছেড়ে বাইরে চাতালে দাঁড়িয়ে আকাশের চাঁদের দিকে বাঁশি তুলে বাজাতে শুরু করেন। সেই সুরে পূর্ণিমা ঈর্ষাতুর হয়ে ওঠে। জ্যোৎস্না যেন নেমে যায়। সুর হয় জ্যোৎস্নার অধিক।

বাসরে কি বাঁশি বাজাচ্ছে ফিরোজ? ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন তাঁর বুবু। না, বাসরের দরোজা খোলা। চাতালে ফিরোজ। একা।

অবাক হয়ে বুবু জিগ্যেস করেন, তুই এখানে? একা?

সে এখনো ঘুমিয়ে আছে।

সন্দেহের সরু চোখে বুবু বলেন, ঘুমিয়ে আছে? এতটা পথ পালকিতে এসেছে, সে না হয় বুঝলাম, ঘুমে ঢলে পড়েছিল। বরণ করবার জন্যে এত তাকে ডাকলাম, এত তার হাত ধরে টানলাম, জাগল না? ঘুমের মানুষই বরণ করে তুললাম। এখনো যদি ঘুমে, তবে এ ঘুম আমার ভালো মনে হচ্ছে না, ফিরোজ।

বিস্মিত হয়ে বুবুর দিকে তাকান ফিরোজ।

ভালো মনে হচ্ছে না তোমার?

বুবু এবার কঠিনস্বরে বলেন, রাজ-রাজত্ব কর, এটুকু বোঝ না? এ ঘুম সাধারণ ঘুম নয়। নিশ্চয়ই কিছু সে খেয়েছে।

চঞ্চল হয়ে বাসরঘরে ছুটে যান ফিরোজ। নাম ধরে ডাক দেন, চাঁদ।

সেই ডাকে পাশ ফেরে চাঁদ।

দ্রুত দরোজার বাইরে বেরিয়ে ফিরোজ বলেন, বুবু, এই তো সে জেগে উঠেছে। সে জেগে উঠেছে, বুবু।

দরোজা বন্ধ করে ফিরোজ আবার আসেন শয্যার পাশে। আবার নাম ধরে ডাকেন, চাঁদ।

চোখ মেলে চাঁদ।

মুখের কাছে মুখ আনেন ফিরোজ।

চাঁদ, ও চাঁদ।

ফিরোজ চুম্বনের জন্যে নত হতেই চমকে উঠতে হয় তাঁকে। বাক্য হয় ছুড়ে দেয়া শিলাখণ্ডের মতো।

আপনি কে?

কে আমি? আমি কে?

তুমি নারী, আমি নর।

তুমি বধূ, আমি বর।

ফিরোজ দেওয়ানের বুকের মধ্যে উতলা হয়ে ওঠে বাঁশির সুর।

হঠাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বসে চাঁদ। ভীত চোখে তাকিয়ে দেখে তার চারপাশ। বুকের ওপর দু'হাত বদ্ধ করে সে, যেনবা নিজের চারদিকে তোলে কঠিন দেয়াল।

সেই দেয়ালের ভেতরে থেকে আবার সে প্রশ্ন করে, কে আপনি?

সকল দানের চেয়ে বড় দান, লোকে বলে, ভয় থেকে মুক্তিদান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বুকের বাঁশিটিকে মুখের হাসি করে ফিরোজ দেওয়ান উত্তর দেন, আমি? আমি তোমার স্বামী।

বাক্য হয় তীক্ষ্ণ বল্লম। এ বল্লমের আঘাতে রক্ত নয়, ক্ষরিত হয় চেতনা নিঃশেষে।

প্রতিধ্বনির মতো 'স্বামী!' শব্দিত হয় চাঁদের কণ্ঠে। বিকট আতঙ্ক তাকে আছাড় দিয়ে শয্যায় ছুড়ে দেয়।

ফিরোজ দেওয়ানের বুবু বলেছিলেন, রাজ-রাজত্ব কর, এটুকু বোঝ না?— হ্যাঁ, বোঝে, বোঝে সে নিশ্চয়। কিছু কিছু বুঝতেও পারছে। তলোয়ারের ফলার মতো একেকটা প্রশ্ন ধার-ঝিলিকে আলো ফেলতে চাইছে যেনবা এক কঠিন সত্যের ওপর।

তবে সে কি জানে না তার বিয়ে হয়েছে?

জানে যদি, আমার পরিচয় জানতে চাইল কেন?

পরিচয় যদি পেল, অজ্ঞান হয়ে গেল কেন?

ফিরোজ দেওয়ান বেরিয়ে আসেন আবার সেই চাতালে। এখনো তাঁর হাতে সেই বাঁশি। কিন্তু বাঁশি রইল হাতেই। জ্যোৎস্না তার ঈর্ষা থেকে বেরিয়ে এসে নীরব অট্টহাস্যে ভরিয়ে দিতে লাগল প্রান্তর।

আপনারই মনে আর নয়, মুখে করেন উচ্চারণ, যদিও কেউ নেই শ্রোতা এখন এখানে, কখনো কখনো নিজেকেই উচ্চারণ করে শোনাতে হয় কোনো কোনো কথা।

তবে কি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ বিয়ে হয়েছে? ঘুমের ওষুধে তাকে অজ্ঞান করে? তবে সে আমার নয়, যদিও সে আমারই ঘরে?

চরণে বিন্ধিলে কাঁটা বক্ষে বাহিরায়।

লোকসকল, চাঁদের যখন চেতন আসে আবার ফিরে, মনে মনে একটি কথাই সে বলে, কী বলে?—আহা, সে এই বলে, যে গান ছিল তার জীবন সেই গান আর সে গাইতে পারে না। কথা বলতে পারে না। না জানি কত কষ্ট তার। না জানি কতক খণ্ডে চূর্ণ তার হিয়া। আমি রাখিব পরান আমার পরানে বান্ধিয়া। আমারই কারণে তার এই অভিশাপ। আমিও তবে কোনোদিন আর এই মানব-মুখে একটি শব্দও উচ্চারণ করব না। বোবা হয়ে থাকব আমিও। বোবা হয়ে আমি সেই বোবার কষ্ট নিজের কষ্ট করে নেব।

দিনের পর দিন যায়, রাতের পর রাত।

দিনের পরে রাত, রাতের পরে দিন, পথের পরে পথ, পথ দিয়ে হেঁটে যায় দুই পথিক, ঘরের ভেতরে বন্দিশালা, বন্দিশালার নাইরে কোনো পথ।

বোবার কষ্ট বোবায় বোঝে, আন্ধার কষ্ট আন্ধা।

ফিরোজ দেওয়ান বলে, হারে, আমি এ কেমন ফেরে পড়লাম বান্ধা।

বুবু বলেন, ফিরোজ রে, আমিও নারী। আমি ওর চক্ষের চাহনি বুঝতে পারি। জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে, চক্ষের পলক পড়ে না, পিতার বাড়ির জন্যে যে নয় বলার দরকার পড়ে না।

ফিরোজকে সাবধান করে দিয়ে বুবু বলেন, আমি নিশ্চয় নিশ্চয় জানি, সে কাহাকেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভালোবাসে, আছে আছে তারই আশে। দুই ঘরে থাকিস তোরা দুইজনে, দেখে সেটা দশজনে। দেওয়ান বংশের সুনাম নষ্ট আমি দেখব না, আর ওই ছিনালির বোবার অভিনয় আমি সহ্য করব না।

ফিরোজ দেওয়ানের কানে ওই অশ্লীল তিরস্কার বড় বাজে। বুবু তার মায়ের সমান। মায়ের মতো করেন তাকে সকল সম্মান। অতএব বুবুর ওপর যে রাগ তা মনেই চেপে রাখেন তিনি। রাখেন সে বড় দুঃখে। দুঃখ তাঁর বাঁশির সুর যাঞা করে, বাঁশি দেওয়ান হাতে তোলেন না।

তারপর একদিন আবার আসে পূর্ণিমা। আবার জগৎ ভেসে যায় জ্যোৎস্নায়। বুকঝিম এক ভালোবাসার ফিনিক দেয়া আলোর ভরে যায় কবির সকল গাথা।

ফিরোজ দেওয়ান চাঁদের ঘরে আসেন। মনে মনে তাঁর কত কথা। চাঁদের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন তিনি, আর আপনার মনে বলেন, সোনার ভুবনে তুমি সোনার হীরামন সারী, রাজ-রাজুয়ার ঘরে কন্যা তুমি হইবা পাটেশ্বরী, শতেক দাসদাসী তোমারে করিবে যতন, অঙ্গেতে পরিবা কন্যা কত রত্ন আভরণ।

কষ্টে বুক ভেঙে যায় ফিরোজ দেওয়ানের। বলেন, সে সব কিছুই বলেন না, কেবল বলেন, চাঁদ, আমার দিকে তাকাও, আমার চোখের দিকে। না, চোখ ফিরিয়ে নিও না। আমাকে দ্যাখো। একটিবার দ্যাখো।

এই প্রথম চোখ তুলে চাঁদ তাকায়।

বিনতি করে ফিরোজ বলেন, শুনেছি তুমিও সুর ভালোবাস। গান ভালোবাস। আমার এই বাঁশির কসম, আমি তোমাকে কিচ্ছু বলব না, তোমার কাছে কিচ্ছু চাইব না, আমি শূন্য হাতে ফিরে যাব আমার বাঁশির কাছে, তুমি আমাকে সত্য কথা বলো, কেন তুমি পথের দিকে তাকিয়ে থাক সারাদিন?—তুমি কার জন্যে তাকিয়ে থাক? তুমি কি কাউকে ভালোবাস?

চাঁদ যে আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে বোবা হয়ে বোবার কষ্ট নিজের করে নেবে।

চাঁদ কোনো উত্তর করে না।

চাঁদ নামিয়ে নেয় চোখ।

ফিরোজ দেওয়ান, তুমি কর রাজ-রাজত্ব, এটুকু বোঝ না? তবে শোন, তোমারই রাজ্যের পাশে কালাপানি খালের পাশে কে-বা করে গান, আর কে-বা এক বোবা বাজায় সারিন্দা, শোনে তোমারই প্রজাসকল গৃহকর্ম ভুলে।

লোকসকল, এই নবীন বয়াতি আর এই বোবা বাজনদারকে ঘিরে এখন মাঝিমাল্লা চাষী সুজনের ভিড়।

লোকসকল, এ বড় ব্যথার গান, এ গান এখন হয়, এ গান আজ থেকে তিরিশ বছর পরেও গীত হবে এই রাজ্যে, এই রাজ্য নয় শুধু, সব রাজ্যে, সব দেশে দেশে, ব্রহ্মপুত্র পুরাতন হবে, নতুন ব্রহ্মপুত্র নবনাম নেবে, লোকে তাকে যমুনা বলবে, যমুনার দুই পাড়ে দেশে দেশে এই গান হবে, আবুল বয়াতি হবে বৃদ্ধ আর মনসুরের দেহ ঝাঁপ দেবে খর ব্রহ্মপুত্র জলে, সেই জলের কিনারে এই ফিরোজ দেওয়ানের পুরী, সেই পুরী প্রাঙ্গণে তিনি, তিনিও বার্ধক্যে, সিংহাসনে বসে বারবার আবুল বয়াতিকে ডেকে বলবেন, গান কর, সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গান, তাহাদের বুকঝিম ভালোবাসা শুনবাম আবার, বয়াতি।

নগদ এখন, এখনো যখন এই বুক ঝিম করা ভালোবাসা তার জাগতিক ইতি টানে নাই, এখনো যখন চাঁদ দিবা আর রাতে আছে পথ চেয়ে, বোবা হয়ে, এখানো ফিরোজ তার স্বামিত্বের স্বাদ নেয় নাই, এখন এই কালে, এই বর্তমান কালে, অর্থাৎ ফিরোজ দেওয়ানের এই যুবকালে, লোকসকল, আপনাদের নিয়ে যাই কালাপানি খালের কিনারে।

সকল সুজনের কাছে নিবেদন করে আজ আবুল বয়াতি, হায় রে ভালোবাসা। হায় রে চাওয়া আর পাওয়া। দিন নাই, উদ্দিশ নাই, অকূল গাঙেতে য্যান একখান ডুবডুব নাও বেয়ে যাওয়া। ডুবি কি ভাসি? ভাসি কি ডুবি? যে ডুবেছে, তার চক্ষের পানি এই গাঙের পানি হইয়াছে। আজ তবে শোনেন সকলে, আমার এই নতুন রচনা।

মনসুর বোবা হলেও বধির তো নয়। সে উৎকর্ণ হয়ে রয়। এ কোন গান রচনা করেছে আবুল?

সারিন্দায় হাত রেখে অপেক্ষায় থাকে মনসুর। গানের প্রথম পদটি শুনলেই সে জেনে যাবে কোন স্বর লাগাতে হবে তার।

লোকসকল, আবুল গান ধরে এবার।

বুকের ভেতরে আষাঢ়ের মেঘ নামে ঘন-বর্ষণে। সারিন্দাটা কপালে ছোঁয়ায় বয়াতি। খলখল করে ওঠে ব্রহ্মপুত্রের জল। ধায় তারা দক্ষিণের দিকে ধায়।

'আ, এই পানি যায়, ভেসে যায়, দূরে যায়, দরিয়ায়।
সৃষ্টির আদি হতে যায় বহে, বহে যায়।
পানি, এই পানি কি গাঙের পানি? ও কি চক্ষেরও পানি?
কালো কমল চক্ষের পানি এই গাঙের পানি?

সারিন্দায় সুর কথা কয়ে ওঠে। মনসুরের ঠোঁট নড়ে। ভাষা তো সরে না তার মুখে, মনে মনে সে গায়, গেয়ে চলে।

'আ, এই পানি যায়, ভেসে যায়, দুটি ফুল দেখা যায়।
পদ্মফুলের জোড়া, তবে ফুল নয়, দু'টি হৃদয়।
পদ্ম, এই পদ্ম, এ যে হৃদয়পদ্ম। ও কি প্রেমের পদ্ম রে?
কাহারো সবুজ আর অবুঝ মন এই যুগল পদ্ম না ধরে।'

মনসুর ভুলে যায় তার নিজের ভালোবাসার কথা। রচনার যাদু তার চোখে সাতরং খেলায়। শিল্পীর তো এইই হয়—ব্যক্তিগত আর থাকে না ব্যক্তিগত, নিজেই সে নিজের সৃষ্টির বিষয় হয়ে যায়। নিজ সৃষ্টি নিজ কষ্টের পাশে বড় সুখের হয়।

'আ, এই পানি যায়, ভেসে যায়, আহা যায়,
নিয়ে যায় একখানা বাঁশি। আর নাই,
সুর নাই, বাঁশি, এই বাঁশি। ও কি মোহন কোনো বাঁশি।
ও কি বন্ধুর বাঁশি তবে?
কারো প্রাণের আকুলতায় একদিন বেজেছিল এই বাঁশি?'

মনসুর উদাস হয়ে যায়। একদিন এভাবেই একজনের কথা দশজনের হয়ে যায়। কৃষ্ণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মোহন বাঁশি সকল প্রেমিকেরই বাঁশি হয়ে আছে।

'আ, এই পানি যায়, ভেসে যায়,
বহে যায় দরিয়ায় পদ্ম আর বাঁশি।
ছেঁড়া পদ্ম আর ভাঙা বাঁশি।
বাঁশির সুরেই কি পদ্মের জন্ম হয়?
একজোড়া পদ্ম তবে ভেসে যায় দরিয়ায়।
এক বুক ঝিম করা ভালোবাসা নিয়ে পানি বহে যায়, দরিয়ায়।
দরিয়ায় সবকিছু ডুবে যায়, মানুষের মনে কিন্তু কিছুই ডোবে না।
সব ভেসে রয়।'

তারপর ভেঙে যায় আসর। পথিক আবার চলে পথ। আবুল বলে, ওস্তাদ, তুমি থাক সাথে, আমরা একসাথে রইবাম। মানুষের মনে আমি এই পানি, দরিয়ার পানি বহাইবাম।

সারিন্দার তারে মনসুর বয়াতি তার নিজ রচনার গানের সুর পথে পথে বাজায়। পুরাতন সেই সুরে কণ্ঠ দিতে আবুলের বুক ফেটে যায়। যতক্ষণ মনসুর বাজায়, সে বোবা হয়ে যায়। আবুল কেবল গায়—এই পানি যায়, বহে যায়, দরিয়ায়।

কিন্তু অনেক সে পুরাতন সুর, নিজের রচনার সুর, সেইসব সুর—তার মধ্যে 'সুরের এই যাদু মন্তর'-এর মনসুর অবিরাম পথে পথে বাজায় বাজায়। চরণে বিন্ধিলে কাঁটা বক্ষে বহিরায়।

ধবল মেঘে কামসিন্দুর কে দিয়াছে মাখি?

ফিরোজ দেওয়ানের শ্বেতবর্ণ ঘোড়ার সেই বাহারি সাজ, জরির ঝালর, চাঁদির সিথা, মখমলে জিন নাই। ঘোড়ার খালি পিঠে ফিরোজ দেওয়ান ঘোড়ার কেশর মুঠিতে ধরে, দুই পায়ে ঘোড়ার পেটে সজোরে আঘাতের পর আঘাত করেন। শিকারির তীরের মতো বন প্রান্তর পার হয়ে ঘোড়া ও সোয়ারি মহব্বত জঙের রাজবাড়ির দিকে ধায়। ধুলোয় অন্ধকার হয়ে যায় পথ। লোকে ভয়ে ছেড়ে দেয় পথ। তোরণের নিচ দিয়ে উল্কার মতো ঘোড়া আকাশের ঠাটার মতো সোয়ারিকে নিয়ে মহলের ভেতরে ঢুকে যায়।

সোয়ারি চিৎকার করে, কোথায়? মহব্বত জঙ তুমি কোথায়? কোথায়?

ঘোড়ার পায়ের দাপে থরথর করে কাঁপে রাজবাড়ি।

মহলের পর মহল পার হয়ে যায় ঘোড়া ও সোয়ারি।

হঠাৎ বাই-মহলে নূপুরের শব্দ পাওয়া যায়।

তবে সে এখানে? বাই-মহলে ঘোড়া নিয়েই প্রবেশ করেন ফিরোজ দেওয়ান। নাচ থামিয়ে বাই লুকোয় মখমলের পর্দার আড়ালে। বাজানদারেরা যন্ত্র ফেলে দুদ্দাড় করে পালিয়ে যায়। মহব্বত জঙের হাত থেকে মদের পাত্র পড়ে গিয়ে ঝনঝন করে ভেঙে যায়।

ঘোড়া থেকে না নেমেই চিৎকার করে ফিরোজ দেওয়ান বলেন, মহব্বত জঙ, এত বড় সর্বনাশ তুমি কেন আমার করলে? আমার কথা ছেড়ে দাও, তোমার আপন ভগ্নি, তোমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সহোদরা যে ভগ্নি, একবারও তার কথা ভাবলে না? উত্তর কী দেবে তুমি আর? নেশায় তুমি ঢুলুঢুলু, কোথায় তোমার বেগম?

ফিরোজ দেওয়ান ঘোড়ার পেটে আবার মারেন লাথি। জেনানা-মহলের দিকে ধেয়ে যান তিনি। অকস্মাৎ স্মরণ হয়, ক্রোধে লোক অন্ধ হয়। বেগমদের মহলে তো এভাবে ঘোড়া ছুটিয়ে, সব তছনছ করে, ভেঙেচুরে প্রবেশ করতে পারে না কোনো ভদ্রজন।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামেন তিনি। মতি বাঁদি ছুটে আসে। সেলাম করে সমুখে দাঁড়াতেই ফিরোজ বলেন, তোমাদের বেগম সাহেবার সাক্ষাৎপ্রার্থী আমি। তাঁকে আমার সেলাম দিয়ে বলো, দাসী, আমার হাতে সময় নাই। আমি আজ আত্মীয়তা করতে আসি নাই।

সাক্ষাতের আয়োজন হয় অবিলম্বে।

বেগম মহলের বসবার ঘরে অশান্ত পায়চারি করেন ফিরোজ দেওয়ান। মসলিনের পর্দার আড়ালে এসে নিঃশব্দে দাঁড়ান নূরজাহান। পর্দার আবরণ ভেদ করে তিনি দেখতে পান ফিরোজকে। যেন বা একখণ্ড ঝড়ের মেঘ আকাশময় দাপাদাপি করছে।

একসময়, নূরজাহান হাতের কাঁকনে নাড়া দিয়ে ঝুনুঝুনু শব্দ করেন। ফিরোজ দেওয়ান একপলক তাকিয়েই দেখতে পান মসলিন ভেদ করে গোলাপি শাড়ির আভা। হৃদয়ের সমস্ত ক্রোধ, দুঃখ, প্রশ্ন প্রশমিত করে শান্তস্বরে তিনি বলেন, সেলাম, ভাবিজান।

সেলাম, দুলামিয়া।

দুলামিয়া—শব্দটি শেল হানে ফিরোজের বুকে। আর নিজেকে শান্ত রাখতে পারেন না তিনি। অধীর হয়ে বলেন, আমাকে পরিহাস করা আপনার শোভা পায় না।

পরিহাস?

পরিহাস নয় তো কী? আমি কি সত্যিই আপনাদের দুলামিয়া?

পর্দার ওপারে নূরজাহানের দীর্ঘ নীরবতা।

ফিরোজ তখন বলেন, দুলামিয়া আপনি আমাকে বলতে পারতেন যদি আপনার ননদিনীকে আমি স্ত্রী বলে স্বীকার করতে পারতাম। আমার সময় কম। প্রশ্নও মাত্র একটি।

আমার সঙ্গে বিবাহের একটি অভিনয় আপনারা করেছেন বলে আমি মনে করি। আমি মনে করি, তাকে নিদ্রাবটিকা খাইয়ে অচেতন করে রাখা হয়েছিল এবং তার কাচ থেকে বিবাহের কবুল গ্রহণ করা হয় নাই। অবস্থাদৃষ্টে আমি ধারণা করি, আপনার ননদিনী আমার আগেই অন্য কাউকে ভালোবেসেছে। প্রশ্ন এই—আমার ধারণা কি সত্য?

মসলিন পর্দা ওড়ে বাতাসে। পর্দার ওপারে নীরবতা।

ফিরোজ দেওয়ান একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। জানতে চান, কে সে?

পর্দার ওপারে আবার নীরবতা। বড় দীর্ঘ নীরবতা এবার।

আমাকে জানতেই হবে, কে সে? আপনি সত্য কথা বলতে ভীত নন বলেই আমি বিশ্বাস করতে চাই। বলুন আমাকে। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, তার নাম আমাকে নির্ভয়ে আপনি বলতে পারেন। আমার প্রজাদের কাছে অজানা নেই যে, আর সব ভূঁইয়ারা যা পারেন তা আমি পারি না, পারিনি, মানুষ তো দূরের কথা, একটি পাখিও আমি এ জীবনে হত্যা করিনি। আপনি নিশ্চিত থাকুন, যা সত্য তা যখন জানব, যত ভীষণ নির্মম হোক সত্য,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আপনার ননদিনী বা তার সেই ভালোবাসার মানুষটির এতটুকু ক্ষতি আমি করব না, কোনো প্রতিহিংসা আমি মনে ধরব না। আমি শুধু সত্য জানতে চাই।

অস্ফুটস্বরে নূরজাহান উত্তর দেয়, তাতে যে ভালো হবে না, ভাই।

ফিরোজ তখন নিজেকে শান্ত করবার জন্যে একটু সময় নেন। তারপর ধীরকণ্ঠে বলেন, এর চেয়ে তো খারাপ হবে না, ভাবি। এই তিলে তিলে জ্বলে পুড়ে প্রতি মুহূর্তে দগ্ধে মরা? এর চেয়ে একটা আগুন দপ করে জ্বলে উঠুক, যদি তাতে সব ছাই হয়ে যায় যাক। যদি খাঁটি সোনা বেরিয়ে আসে, আসুক।—ভাবি, কে সে? আমি কি তাকে চিনি? জানি? দেখেছি তাকে?

পর্দার আড়াল থেকে নূরজাহান এবার বেরিয়ে আসে ফিরোজ দেওয়ানের সমুখে। ভাই বলে ডেকেছি, সমুখে আসতে বাধা কী? সত্যই যদি বলতে হয়, আড়াল থেকেই বা কেন? ভাই, শুনুন তাহলে। আপনি তাকে দেখেছেন। আপনি যেদিন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন, সেদিন সে কাছারির সদর প্রাঙ্গণে গান করছিল।

ফিরোজ দেওয়ান বাঁশির পাগল, সুরের পাগল। সেদিনের সেই সুরটি তার অন্তরের কোন অতলে ছিল, ভালো লেগেছিল বলেই বুঝি অতলেই সে সুর গলে মিশে যায়নি। নূরজাহানের মুখে পরিচয় পাবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের মধ্যে ফোয়ারার মুখ খুলে যায়। ফোয়ারার ধারায় ধারায় সুর হতে থাকে—'সুরের এই যাদুমন্তরে, বন্দি করে, বন্দি করে।'

সেই সুর বাঁশির সাত ছিদ্রের কোন কোন বিন্যাসে, প্রশ্বাসের কোন কোন ওঠানামায় ধরা দেবে, যেন তার চিদ্‌পটে সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে যায়।

সে-রাত্রে নিজের পুরীতে চাতালের শেষ সীমানায় বাঁশি হাতে দাঁড়ান ফিরোজ দেওয়ান। সবকিছু ঘুমের গভীরে। গাছ, নদী, বাড়ি, মানুষ। এমন এ পরীনামা নিস্তব্ধ রাতে, দুই চোখ বুজে, সুরের সেই উড়ে যাওয়া পাখিটির সন্ধানে মনের মধ্যে উড়াল দেন ফিরোজ দেওয়ান। গানের শেষটুকুই কেবল শুনেছিলেন তিনি।

ধরা দিয়েও ধরা দেয় না পাখি।

বাঁশির ছিদ্রে আঙুল খেলা করে, একটি দুটি বালক বুঝি ছোঁয়া যায়, অধরা থেকে যায় ডানা। তারপর হঠাৎ যেন নিজেই এসে ধরা দেয় সুরের সেই পাখি। পাখিটি এসে তার বাঁশির সাতটি ছিদ্রে ছড়িয়ে দেয় পাখা। মনের মধ্যে কথাগুলো বাজে, সুর বেজে ওঠে তার মোহন বাঁশিতে।

'বন্দি করে, বন্দি করে; সুরের এই যাদু মন্তরে
পাষাণও গলিয়া যায়, চক্ষুও ভাসিয়া যায়
শিকলও কাটিয়া যায়, সুরের এই যাদুমন্তরে।
মনের সুরে গানের সুরে বঁধুর অঞ্চল টেনে রে
ঘরেরও বাহির করে রে।'

ঘুমের ভেতরে চাঁদ, তার কানে পশে এই সুর। চমকে লাফিয়ে শয্যা ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে আসে সে।

কোথায়? কোথায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে একটি মানুষ। ভ্রম হয় চাঁদ সুলতানার। মানুষটিকে ঝাঁপিয়ে জড়িয়ে ধরে সে ডেকে ওঠে, মনসুর!

ফিরোজ দেওয়ান অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেন। আপনার মনে আপনি যে তিনি নিজের স্বর শোনেন—চাঁদ, ও চাঁদ, আমি তো মনসুর নই, এ কথা কেমনে কই, খেলার ঘর ভাইঙ্গা গেল, মালা হইল বাসি, একদিকে ফুরায়া গেল চাম্পা ফুলের হাসি।

অচিরেই সম্বিৎ ফিরে পায় চাঁদ। মনসুর কই? কোথায় মনসুর? এ যে ফিরোজ দেওয়ান।

আহা, লোকসকল, এ চিত্র আমি কেমন করে আঁকি? মেঘের বরণ আজ কামসিন্দুর, কে মাখাল সে সিন্দুর যে আর অপ্রকাশ নাই।

ফিরোজ দেওয়ান বলেন, মনসুর বয়াতিকে তুমি তবে ভালোবাস? সত্য কথা কও তুমি, সত্য কথা কও।

থরথর করে কেঁপে ওঠে চাঁদের রাঙা ঠোঁট। সেই ঠোঁটে ভাষা ভর করতে চায়, 'ভালোবাসি তারে আমি সাক্ষী আছে যমুনার জল, চন্দনে মিশায়া তারে রাখবাম, করবাম তারে আমি চক্ষের কাজল।' কিন্তু এক বর্ণ উচ্চারণ করতে পারে না সে।

লোকসকল, আমরা কি আগেই জানি নাই, চাঁদ নিজে রচনা করতে পারে পদ। পাল্লা কি দেয় নাই একদিন মনসুরের সাথে? আমরা কি এমন ভেবে নিতে পারি না? এই যে মানবী চাঁদ, সাধুভাষা চন্দ্র তারে কয়, এই চন্দ্র একদিন পূর্ববঙ্গ গীতিকার চন্দ্রাবতী হয়ে বুঝি পরজন্ম লয়। আজ এই জন্মে চন্দ্রাবতী তার মনে ভর করে, এই মত স্বরে,

'বুদ্ধি নাই লো রাজকন্যা, তুমি বুইঝ্যা কথা কও।
দুঃখে ভরা ডালা কন্যা, কেনে মাথায় তুইলা লও।
চিরসুখে আছো কন্যা, দুঃখ নাই সে জানো,
সরল পন্থা ছাইড়া কেন যাও যে কাঁটার বনও।
অমৃত ছাড়িয়া কেনে বিষে কইবা ভালা?
তুমি তো জানো না কত গরল বিষের জ্বালা।
হিয়ারে না কাটো কন্যা আপন হাতের নোখে,
তোমারে না মন্দ করে রাজপুরীর লোকে।'

প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়ে চাঁদ। চাতালে পাষাণে পড়ে যাবার আগেই ফিরোজ দেওয়ান তাকে ধরে ফেলেন। বন্ধুর মতো মমতায় তাকে নিয়ে শয্যায় শোয়ান। বলেন, চাঁদ, তোমার মুখে আমি হাসি দেখতে চাই। তোমার ঠোঁটে আমি কথা শুনতে চাই। তোমাকে যদি হারিয়ে ফেলতেও হয়, তবু আমি তোমার জন্যে আমার মুখে হাসি রাখতে চাই। মনসুর বয়াতিকে তুমি তবে ভালোবাস, এই কথা একবার মুখ ফুটে আমাকে বলো।

ফিরাজ দেওয়ানের পায়ের কাছে বসে পড়ে বিলাপ করে চাঁদ।

'তুমি ছাড়া আমি নারীর কোনো গতি নাই,
আগো তুমি কইয়া দিও আমি কোথায় যাই?
পাখি বলে, আমার সাথে যাইবা নাকি উড়ে?
আঁখি বলে, একবার আমি দেখবাম বন্ধুরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জগৎ বলে, পুরান কথা মনে করতে নাই।
দারুণ বিষে হইয়াছে রে গানের পাখি বোবা।
কপাল দোষে পুইড়াছে যে বাগানেরই শোভা।
অহর্নিশে তুষের আগুন কারেবান্ জানাই।
হাত বান্ধি, পাও বান্ধি, বান্ধি দেহটারে,
তবু কান্দি, আমি কান্দি সারিন্দারও তারে।
সোনাচান্দির মূল্য কি যার কানের সোনার নাই।'

ফিরোজ দেওয়ান চাঁদ সুলতানাকে ধরে আসনে বসিয়ে বলেন, আমাকে একবার তুমি নিজমুখে বলো, তার কাছে যেতে চাও। মাথার ওপরে একজন আছেন, তিনি জানেন সেদিকে রুপা, রূপ-যৌবন তুচ্ছ, আর এই তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে আছে এক—কী সেই এক? সেই এক—বুকঝিম করা এক ভালোবাসা। আমি সেই ভালোবাসা তোমাকে ফিরিয়ে দিতে চাই, চাঁদ।

আরে পাগল পান্থ তুমি চলো আমার সাথে।

লোকসকল, রাতের পর রাত যায়, দিনের পর দিন। মানুষ সময়ের অধীন। আবার সেই সময় বটে মানুষেরও অধীন।

কীভাবে অধীন?

এইভাবে অধীন সময়, যে মানুষ যখন ভাবের ঘোরের ভাবের জ্বরে ভাবের গভীরে তার অন্তর পুরে রয়, সময় থাকে স্থির, সময় না বয়।

দিবা আর রাত্রিকাল আসে যায়, যায় আর আসে।

ফিরোজ দেওয়ান আর চাঁদ সুলতানার মধ্যভাগে স্থির হয়ে ভাসে, ভাসে এক লোহার ভার ভাসে।

এ লোহা ফিরোজের মনে সোনার চেয়ে ইদানীং ভার। আগে কন্যা তুমি নিজমুখে দেবে সমাচার।

কাকে তুমি ভালোবাস? কাকে তুমি দিয়ে আছো মন?

কন্যা, তুমি নিজমুখে কর উচ্চারণ।

কিন্তু চাঁদ সুলতানা কিছুতেই বলে না তার নাম। ফিরোজ দেওয়ানেরও জিদ, আমি তো জানিই তার নাম, তবু তোমার নিজের মুখে একবার শুনতে চাই, চাঁদ, তবে আমি অন্তরে নিশ্চিত হব। আমি নিশ্চিত হব যে, সত্যি তুমি ভালোবাস তাকে। এতখানি ভালোবাস, কলেমা পড়ে যে সম্পর্ক হয়েছিল তোমার আমার, তবু তা সত্ত্বেও তার নাম উচ্চারণে দ্বিধা নাই এতটুকু তোমার।

ফিরোজ বলেন, তুমি বলো। নাম বলো। একবার নাম বলো তার। তারপরে তুমি যা চাও, তাই হবে। তাই দেব। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার কোনো সাধ আমি অপূর্ণ রাখব না। আমার এই বাঁশির কসম, এই বাঁশি শুনেই না তুমি ভুল করে তার নাম ধরে ডেকে উঠেছিলে সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পূর্ণিমার রাতে। আজ আবার পূর্ণিমা।

এত বলে বাঁশি নিয়ে ঠোঁটে স্থাপন করে ফিরোজ দেওয়ান। তাঁর অন্তর কাঁদে।

এ নারী আমার, তবু আমার সে নয়। যদি তাকে ছেড়ে দিতে হয়, এই মূল্য চাই আমি—স্বাধীন দাঁড়িয়ে বলো, এই তার নাম, ওগো, আমি তাকে ভালোবাসি।

মনসুর বয়াতির সেই গানের সুর—'সুরের এই যাদু মন্তরে বন্দি করে বন্দি করে' ফুঁপিয়ে ওঠে ফিরোজের বাঁশিতে। কেঁদে ওঠে আকাশের চাঁদ। ধরনীর চাঁদ ভাসে জ্যোৎস্নার প্লাবনে।

আত্মহারা হয়ে বলে চাঁদ, নাম তার মনসুর বয়াতি।

ফিরোজের বাঁশি বেজে ওঠে। এবার দুচোখ বেয়ে অশ্রু পড়ে তার। ভিজে যায় বাঁশি। বাঁশি আর চোখ ভিজে যায়, কারণ তো এই—মানুষ যা পায় আর যা হারায় তার মূলে আছে বাক্য উচ্চারণ।

মানুষেরই উচ্চারণে উত্থান পতন।

কারো বা অন্তরে আছে আল্লাতালা একেশ্বর, তবু সেই আল্লাই আদেশ করেন পবিত্র কালামে, বলো, আল্লা একেশ্বর।

কারো বা অন্তরে আছে বিষ্ণু মহেশ্বর, তবু সেই মহেশ্বর কন, বিষ্ণু বিষ্ণু কর তুমি জিহ্বায় জপন।

জ্যোৎস্নায় প্লাবিত ভুবন ঘুরে ঘুরে ফিরোজের বাঁশির সুর ক্রমে ধীরে ক্ষীণ আরো ক্ষীণতর হয়।

বাঁশি নামিয়ে ফিরোজ বলে, তোমার বুকের ভালোবাসা যে আমার বাঁশির সুরের সহোদরা বোন। তবে আমিই তোমার সব দুঃখের কারণ। চাঁদ তুমি এইবার সত্য কথা কবে। বলো, কী করিলে কিসে তুমি চিরসুখী হবে?

দুই নয়নে ঝরে ধারা, কন্যা ধীরে কয়,

'এ কথা জিজ্ঞাসা করা, রাজা, তোমার উচিত নাই তো হয়।
তুমি তো রাইজ্যের রাজা গো, রাইজ্য দিতে পারো।
যাহা ইচ্ছা দিবা তুমি, আমারে কেন বা ধরো?'

'শুন শুন সুন্দর কন্যা, আমি কহি যে তোমারে—
যাহা কইবাম তাহা দিবাম, আমার কথা নাই সে ফিরে।'

'অধীন আমি, আমার কথায় কী আর হয়?
তোমার ইচ্ছায় হইব দান, অন্য নাই সে হয়।'

'শুন শুন কন্যা, তুমি এই রাইজ্যের রানি।
তোমার কথা সত্য হইব, লইবাম আমি মানি।'

'যদি বলি রাজ-রাজত্বি তুমি দিবা তারে?'

'দিবাম দিবাম আমি তিন সত্য করে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

‘যদি বলি দিবা যত মহামূল্য ধন,
নগরেতে আছে যত রত্নাদি কাঞ্চন?’

‘খুইলা তো দিবাম রাইজ্যের ভাণ্ডারা,
সত্য করিলাম, কন্যা, তুমি আমার নয়ান-তারা।’

তখন নয়ন মুছে চাঁদ বলে, ধর্ম সাক্ষী করে তুমি দিতে চেয়েছ যা-ই আমি চাই। আমি চাই ফিরিয়ে দিতে কণ্ঠ তার। তারপর...। অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে চাঁদ বলে, তাকে তুমি খুঁজে আনো কবিরাজ ডেকে আনো, চিকিৎসা করাও। একবার আবার তার শুনবাম গান, রাজা তুমি অধীনেরে এই করো দান।

কালাপানির খালপাড়ে পাকুড়ের গাছের নিচে অচেতন শুয়ে আছে মনসুর বয়াতি। তার পাশে জেগে আছে তার সাথের সাথী আবুল।

ফিরোজ দেওয়ান ছুটে এসেছেন এখানে। একাই তিনি এসেছেন। পাইক পেয়াদা বরকন্দাজ সঙ্গে আনেননি কাউকে। এসেছেন জরির আঙরাখা খুলে সাধারণ তাঁতের চাদরে তাঁর সর্বাঙ্গ মুড়ে। এ তো রাজার কোনো রাজকার্য নয়—এ হচ্ছে ভেঙে ফেলা হৃদয়, তাঁর নিজের হৃদয়। আর তারপর, ফিরিয়ে দেয়া আরেক হৃদয়ের কাছে নিজের হৃদয়তুল্য চাঁদের হৃদয়।

মাথার ওপরে শেষরাতের তারা।

আকাশে ভোর ভাঙার ইশারা। হিমঝিম হাওয়া। গাছে গাছে পাখি তার পাখা নাড়ে, ফুল পড়ে বাগানে বাগানে।

পাখির ডানায় ধরে রক্তের ঝিলিক লাল।

ফুলে ফুলে ভরে ওঠে পূজারীর থাল।

শোনা যায় ভোরের আজান। মানুষের ঘুম ভাঙে, ঘুমের চেয়ে যে বড় উত্তম উপাসনা, তাই।

শুধু এই একজন, তার চোখে ঘুম ভাঙে নাই।

মনসুর ঘুমে অচেতন।

ব্যাকুল হয়ে ফিরোজ দেওয়ান বলেন, জাগাও, জাগিয়ে দাও বয়াতিকে।

সাধারণত সুতির চাদরে তার সর্বাঙ্গ আবৃত থাকলে, আবুল তাকে চিনে ফেলে। এই রাজপ্রতাপ কণ্ঠ, আর কণ্ঠে এই আদেশ তো দেওয়ান ছাড়া আর কারো পক্ষে মোটেও সম্ভব নয়।

সেলাম করে সে দাঁড়ায়। বলে, আজ তিন দিন তিন রাত জেগে আছি বয়াতির পাশে। এই ঘুম বুঝি আর ভাঙবে না, হুজুর।

চমকে ওঠেন ফিরোজ দেওয়ান।

কেন?

হাত দিয়ে মনসুরের নিঃশ্বাস পরীক্ষা করেন তিনি বড় ব্যস্ত হয়ে। নিঃশ্বাস বয় কী বয় না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কিছু বোঝা যায় না যে। অস্থির হয়ে তিনি কান পেতে বুকের ভেতরে শব্দ শোনার চেষ্টা করেন। শীতল সে বুক বটে। নীরব বলেই যেন মনে হয়। হাহাকার করে ওঠেন ফিরোজ দেওয়ান।

নাই, তবে আর নাই?

আবুলের কথায় তিনি স্থিত হন ঈষৎ। আবুল বলে, এখনো জীবন আছে। জীবন এখনো বয়। তবে বড় ক্ষীণ, কখন কী হয়?

কী করে এমন হলো?

হুজুর, তাহলে নিবেদন করি, যদি দোষ না ধরেন। মহব্বত জঙ তাকে বিষ দিয়েছিল। সেই বিষ বোবা করেছিল, কিন্তু সে বিষের কাজ মনে হয় এখনো চলছে। বিষ পড়ার পর প্রথম যে অচেতন হয়ে যায়, আবার সে লক্ষণ দেখা যায় তিন দিন আগে। বুকের খাঁচার মধ্যে প্রাণ তার কোনোমতে ধুকধুক করে। বুঝি আর আশা নাই। বুঝি সেই বিষ তার স্বরে শুধু নয়, প্রাণ বুঝি লয়।

রাজবাড়ি থেকে একাই এসেছিলেন ফিরোজ দেওয়ান। কিন্তু রাজা কি আর রাজপুরী থেকে সকলের চোখে ধূলি দিয়ে বেরোতে পারেন? তাঁকে অনুসরণ করে এসেছিল পাইক-পেয়াদা আর হরকরা। ফিরোজ দেওয়ান চোখ তুলে দেখতে পান তাদের।

ব্যাকুল হয়ে আদেশ করেন তিনি, এই মানুষটাকে নিয়ে চল আমার পুরীতে, আর জরুরি খবর দাও আমার রাজবৈদ্য ভোলানাথ শাস্ত্রীকে।

কিবান্ করি, কেমনে রে খালাস হইব বিষ?

কাছারির বাইরে যে অতিথিশালা, নিজ হাতে বড় যত্নে শয্যা পেতে ফিরোজ দেওয়ান, অচেতন মনসুরকে শোয়ান। অন্দরে গিয়ে তিনি চাঁদ সুলতানাকে কন, চাঁদ, আমি তাকে নিয়ে এসেছি। আমি তার কণ্ঠ ফিরে দেবার জন্যে আমার সাধ্যে যতটুকু আছে, মানুষের সাধ্যে আছে যতটুকু, সবই করব।

আমি তাকে একবার দেখব, আমি তাকে একবার দেখতে চাই।

ফিরোজ তখন চাঁদের দুহাত ধরে বলেন, তুমি না বলেছিলে, কন্যা, কণ্ঠ ফিরে যদি পায়, একবার শুনবে তার গান। তদুপরি কথা আছে, দেওয়ান বংশের সম্মান। এ বংশের রীতি নেই রানি পার হয়ে রাজবাড়ির তোরণ—এই হচ্ছে বিধান।

হরকরা ছুটে আসে। সংবাদ আনে—এসেছেন রাজবৈদ্য।

ফিরোজ বিদ্যুদ্বেগে অতিথিশালায় এসে দেখতে পান, ভোলানাথ শাস্ত্রী বসে নেই। রোগীকে তিনি পরীক্ষা করছেন।

অস্থির হয়ে ফিরোজ জানতে চান, পারবেন, আপনি পারবেন এই রোগী ভালো করতে?

ভোলানাথ মনসুরের পাশ থেকে ধীরে উঠে দাঁড়ান। দেওয়ানের সম্মুখে তিনি মাথা নত করে নীরবেই দাঁড়িয়ে থাকেন।

উত্তর, উত্তর দিন, ভোলানাথ, রাজবৈদ্য দেওয়ান বংশের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রুপার মতো চুল রাজবৈদ্যের। সহস্র সহস্র রোগী নিরাময় করেছেন অতীতে। ফিরোজ দেওয়ানের পিতার আমল থেকে রাজবৈদ্য তিনি। দেওয়ানের দিকে চোখ তুলে পুত্রের সমান চোখে দৃষ্টিপাত করে তিনি মৃদু হেসে বলেন, লোকে বলে নাকি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। এমন কোনো ব্যাধি নাই যা নাকি নিরাময় করতে পারি না। লোকে তো এমনও বলে, আমি স্বয়ং উপস্থিত হলে মরাও জীবন পায়, বেঁচে ওঠে। কী যে তারা বলে! মানুষের সাধ্য কি আছে মরাকে বাঁচায়?

ফিরোজ চিৎকার করে বলেন, কিন্তু তার দেহে তো এখনো জীবন আছে।

আছে, সত্য আছে। তবে তার দেহে যে বিষ আছে, সে বড় দারুণ বিষ, সেই বিষের চিকিৎসা যে আমার জানা নাই।

হতভম্ব হয়ে যান ফিরোজ দেওয়ান। যেন তাঁরই দেহ থেকে প্রাণপাখি উড়ে যায়।

অন্দরে মেঝের 'পরে চাঁদ পড়ে থাকে সেজদায়, সে কাঁদে আর বলে, প্রভু নিরঞ্জন, আমার জীবন লও, তারে দেও আমার জীবন।

রাজবৈদ্য ভোলানাথ শাস্ত্রী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন।

তাঁর হাত ধরে বিনতি করে ফিরোজ বলেন, তবে? তবে কোনো উপায় কি নেই? এ বিষ নামাতে পারে এমন চিকিৎসা তবে কারো জানা নেই?

জানে একজন।

রাজবৈদ্যের কথা শুনে ফিরোজ যেন অন্ধকারে শর্করার মতো আলোর সাক্ষাৎ পান। বৈদ্যের হাত ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন, কে সে?

বেদের সর্দার সে। নাম তার হোমরা বাইদ্যা।

কিন্তু সেতো বৈদ্য নয়। সাপ ধরে, সাপ খেলায়।

ওই সাপই যে এ বিষের ওষুধ, হুজুর। শাস্ত্রে বলে—বিষে বিষক্ষয়। এই রোগী ভালো যদি করতে হয়, সর্পবিষ চাই। তাও যে-কোনো সাপ নয়, সবচেয়ে বিষধর যে সাপ, সেই ত্রিশিরা সাপের বিষ এই দণ্ডে চাই।

ত্রিশিরা সাপের কথা শুনেই চমকে ওঠে উপস্থিত সকলের অন্তরাত্মা।

কালা সাপ, ধলা সাপ, সিধা সাপ, বাঁকা সাপ, বঙ্করাজ, দুধরাজ, গোক্ষুরা, কেউটিয়া। এ সকল সাপের রাজা—যার নাম ত্রিশিরা, সে নাম শুনলে পরে ছোবলেরও আগে, বিষে নীল লোক ঢলে পড়ে, চিতার আগুন জ্বলে, মাটি নিজে কবরের গর্ত খোঁড়ে, এমন সে সাপ।

রাজবৈদ্য ভোলানাথ শাস্ত্রী বড় স্নেহে ফিরোজ দেওয়ানের হাতে হাত রেখে বলে, বাপ, তোমার পিতার বৈদ্য ছিলাম আমি, এখন তুমি দেওয়ান, তুমি এত বিচলিত দেখে আমার অস্থির পরান। আমার যা জানা আছে সবই বললাম। ত্রিশিরা সাপের দংশন যদি এই রোগীর দেহে দেয়া যায়, তবে বিষক্ষয় হবে, আর কিছুতেই নয়।

ফিরোজ দেওয়ান আদেশ করেন পাইক পেয়াদা বরকন্দাজ। যেখান থেকে পারিস, নিয়ে আয় হোমরা বেদেকে। রাজার ভাণ্ডার দেব খুলে যদি এই রোগী ভালো করতে পারে।

বাধা দিয়ে রাজবৈদ্য বলেন তখন, একবার শেষবার চিন্তা করে দেখুন, দেওয়ান। যে সে সাপ নয়, ত্রিশিরা সাপ, যার দংশন মাত্রে মানুষের মৃত্যু শুধু নয়, দেহমাংস গলে খসে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এ যে বড় ভীষণ চিকিৎসা, বাপ। মৃত্যুর সম্ভাবনা ষোলআনা।

আর জীবনের সম্ভাবনা?

উদ্দেশে প্রণাম করে রাজবৈদ্য বলেন উত্তরে, ভগবান ভিন্ন কেউ বলতে পারে না।

এক মুহূর্ত চিন্তা করেন ফিরোজ দেওয়ান। মনের মধ্যে ফুকার দিয়ে বেজে ওঠে বাঁশি। চাঁদ, আমিও তোমাকে ভালোবাসি। পর মুহূর্তেই ভেতর থেকে উচ্চারিত হয়, না না, আমি তোমার ভালোবাসাকে ভালোবাসি, চাঁদ।

নিরঞ্জন প্রভু সেই নিরাকার প্রভু, সেই জগতের যিনি করতার, তাঁর নাম স্মরণ করে, তার উদ্দেশ্যে নীরবে বিনতি করে 'তুমি তাকে জীবন দাও, কণ্ঠ দাও, বারিতাল্লা' বলে ফিরোজ দেওয়ান চতুর্দিকে মানুষ পাঠান।

আন্, আন্, হোমরা বেদেকে তোরা আমার রাজ্যে আন্।

এত বলে চাঁদের মহলের দিকে দ্রুত পায়ে ফিরে যান তিনি। সেজদায় পড়ে আছে চাঁদ। সংবাদ না পেলে তারও যদি বন্ধ হয়ে যায় হৃদস্পন্দন।

লোকসকল, দিকে দিকে মানুষ যখন ছোটে, ছোটার কারণ কারো কাছে থাকে না গোপন।

অন্দরে ফিরোজের বুবু ফিরোজের পথ আটকে চানতে চান, কার জন্যে এত আয়োজন? কার জন্যে বেদের তালাশ?

যদিও অজানা আর কিছু নেই তাঁর কাছে, তাঁরও আছে দাসী, আছে চর, তারাই সকল কথা জানিয়েছে একটু আগেই, কিন্তু তিনি ফিরোজেরই মুখ থেকে সব শুনতে চান।

ফিরোজ নীরব।

রোগীটি কে? তুই তার পরিচয় বল্।

নীরব ফিরোজ।

বুবু ছুটে চাঁদের ঘরে যান। দেখেন, সে সেজদায় পড়ে আছে। নামাজের পাটি ভিজে গেছে তার চোখের পানিতে।

বৌমা!

উত্তর নেই।

বৌমা!!

উত্তর নেই।

বুবুকে তিরস্কার করে ফিরোজ বলেন, নামাজের মানুষকে ডাকেন?

কিসের নামাজ? ফজরের পরে আরো বহু দূরে আছে জোহরের নামাজের সময়। কিসের নামাজ বল্। কার জন্যে বৌমার চোখে পানি। কার জন্যে আল্লার কাছে পড়ে আছে সেজদায়?

ফিরোজ উত্তর দেন, মানুষেরই জন্যে আসে মানুষের চোখে পানি, বুবু। আপনি এই কামরা ছেড়ে চলে যান।

এত বড় কথা কোনোদিন ফিরোজ তাঁর বুবুকে বলেননি। পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে যান বুবু। কিন্তু চোখে অগ্নি ওঠে জ্বলে। অগ্নির শব্দ হয় কখন? যখন অগ্নিতে পোড়ে ঘর। বুবু যেন কানে সেই অগ্নির চড়চড় শব্দ শুনতে পান। তিনিও দেওয়ান বংশের কন্যা, উত্তেজনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অস্থিরতা অভিশাপ প্রতিহিংসা ধর্মরক্ষা মানরক্ষা বুকবন্দি করে তিনি ঘর ছেড়ে চলে যান।

হোমরা বেদে এসে বলে, দেওয়ানের হুকুম, কিন্তু তারো চেয়ে বড় হুকুম উপরে যিনি আছেন সেই তাঁর। দেওয়ানের হুকুম কানে শোনা যায়, উপরের হুকুম আমি শুনতে পাই তেমন বড় পুণ্যবান নই। তবে আমি শেষ চেষ্টা করি। এসো ভাই, ধরাধরি করি এই মানুষটাকে নিয়ে যাই নদীর কিনারে।

বিষে অচেতন মনসুর বয়াতিকে মানুষেরা নিয়ে যায়। স্থাপন করে তাকে ব্রহ্মপুত্র জলের কিনারে।

হোমরা বেদে পাইক বরকন্দাজ ডেকে বলে, কেটে আনো সাতখানি কলাগাছ এই দণ্ডে।

ব্যাকুল হয়ে চাঁদ সুলতানা প্রশ্ন করে ফিরোজ দেওয়ানকে, নদীর পাড়ে কেন নিয়ে গেল তাকে? নদীর পাড়ে যদি নিল, কলাগাছ কাটছে কেন ওরা?

এমন সময় আসে মানুষের জীবনে, যখন কোনো কিছু করা যায় না গোপন। করা উচিত না হয়। মানুষের দেহে মনে আছে সর্বশক্তি তবু তারও আছে সীমা। সকল প্রকাশ্য যদি না হয় সংকটের কালে, তবে সেই সীমা হয় লঙ্ঘিত। মন ঢেকে যায় গাঢ় অমাবস্যায়, শক্তি তার সীমা পার হয়ে যায়। মৃত্যুর আগেই তার মৃত্যু হয়ে যায়।

ফিরোজ বলেন, কী করিব গোপন আমি? কী আর কথা কব। তোমারে সুখিনী দেখে দুঃখবেশ লব। তবে শোনো, চাঁদ। এ বড় বিষম চিকিৎসা। ত্রিশিরা সাপের বিষ একমাত্র ওষুধ। ত্রিশিরার দংশনে যদি বোবা ভালো হয়। আর যদি না-ই হয়, মৃত্যু নিশ্চয়। তাই ওরা কলার ভেলা বানায়। যদি মারা যায়, কলার ভেলায় তবে লখিন্দর ভাসাবে তখন ওরা ব্রহ্মপুত্র জলে।

চোখের জলে ভেসে চাঁদ বলে, আমার তো অন্দর থেকে বেরোবার রীতি নেই। তুমি যাও তার কাছে।

ফিরোজ বলে, কন্যা লো যাইতাম আমি তোমারই কারণে। তোমারই না প্রতিনিধি হয়া আমি খাড়া থাকতাম সেখানে। কিন্তু, আমার করে ভয়। বুবুর জন্যে ভয়। জানি না তিনি কী শুনেছেন, কী জেনেছেন, যদি কিছু জেনে থাকেন, তবে তোমাকে একা এই পুরীতে পেয়ে যদি কিছু করেন? আমি থাকি তোমার কাছে তোমার পাশে, চাঁদ। আমি না তোমার বন্ধু, কইরো না তফাত। আমার আছে লোক লোকন্দর নদীর পাড়ে খাড়া, ভালোমন্দ খবর নিয়া ছুইটা আসবে তারা।

লোকসকল, খলখল করে ছোটে ব্রহ্মপুত্র জল। জীবনের গতির সঙ্গে জলের তুলনাও তো মানুষেই দিয়ে থাকে। যদি ফের সেই জল ফিরে পায় মনসুর বয়াতি। চারপাশে লোকজন ঘন হয়ে আসে।

হোমরা বেদের হাত ঝাঁপ খোলে ত্রিশিরা সাপের। সঙ্গে সঙ্গে ঘন মানুষেরা একের ওপর আর পড়ে আছড়ে, এক লাফে পিছিয়ে যায় সকলে। বিদ্যুতের মতো ফণা তোলে সাপ। চিকন জিহ্বায় তার অগ্নি করে লকলক। চোখ ধকধক। রাগে করে হিসহিস খিসখিস।

হোমরা বেদে তুবড়ি বাজায়। তুবড়ি বাজে। এই সাপ কি সহজে নাচে? চারদিকে সে ফণা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঘুরিয়ে সন্ধান করে কাকে সে দংশাবে।

সাবধান, সাবধান, বাইদ্যা, এই সাপ ত্রিশিরা।

এই সাপ না দংশায় তোমারেই ফিরা?

বেদের রাজা হোমরা বেদে, সাপের সাথে বাস, তার সাপের সাথে ঘর। আর আছে তার কামরূপ কামাখ্যার মন্তর।

মানুষেরা ইস ইস করে ওঠে। হিস হিস করে সাপ তার চিকন মাজা টেনে মনসুরের দিকে লকলক করে যায়। স্থির হয়ে ফণা তুলে একবার সে হোমরার দিকে চায়।

তারপর, হঠাৎ দংশায়।

এতক্ষণ অচেতন হয়ে ছিল মনসুর, কিন্তু মাথা ছিল উত্তরে শয়ান। ত্রিশিরা সাপ দংশাতেই মাথা তার পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ে যায়।

হোমরা বেদে নিজের মাথায় আশাভঙ্গ হয়ে দেয় হাত। মানুষজন করে ওঠে, হায় হায় হায়।

আবুল চিৎকার করে ওঠে, গলা টিপে ধরে হোমরার।

অন্দরে সংবাদ নিয়ে ছুটে আসে ফিরোজের খাস হরকরা।

সর্বনাশ, সর্বনাশ, সাপের বিষে ফিরে নাই প্রাণ। ঢলে পড়েছে নীল দেহ, পশ্চিম মুখে মাথা।

লোকসকল, আপনারা দেখুন এই চাঁদকে। না, সে জ্ঞান হারায় না। মানুষের জ্ঞানের ওপরে থাকে কত রকম আবরণ। সেই সকল আবরণ খসে পড়ে মুহূর্তে। চেতনের চেয়েও অধিক চেতন চাঁদ প্রশ্ন করে, মরে গেছে?

হরকরা বলে, না, এখনো প্রাণ আছে। এই দণ্ডে সাপের বিষ তার শরীর থেকে চুষে বের করতে না পারলে এক্ষুনি সে শেষ হয়ে যাবে।

চিৎকার করে ওঠেন ফিরোজ, হোমরা বেদে কী করেছ?

মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে, হুজুর। সেই কালরক্ত বিষরক্ত একটুখানিও যদি গলার ভেতরে যায়, যে চুষবে সেও মারা যাবে। হোমরা বেদে সাহস পায় না। কেউ নাই যে সাহস পায়। বয়াতির প্রাণ বুঝি এবার সত্য সত্য যায়।

ঘরের ভেতরে বিদ্যুতের লহর বয়ে যায়। চাঁদ ছোটে দরোজার দিকে।

ফিরোজ তাকে জাপটে ধরে বলে, কোথায় যাচ্ছ, চাঁদ?

নদীর পাড়ে। আমি যাব। আমি সাহস পাই। ত্রিশিরা সাপের বিষ কত তার বিষ দেখবাম, সেই বিষরক্ত আমি চুষিয়া তুলবাম।

তুমি? আমি থাকতে তুমি কেন, চাঁদ? চুষতে হয় আমিই সেই কালরক্ত চুষে নিয়ে জীবন দেব তাকে।

এই প্রথম, এই প্রথম সেই মুহূর্ত। এই সেই মুহূর্ত যে মুহূর্তে ভালোবাসার সাক্ষাতে নত হয় বৃক্ষ আর স্তম্ভিত হয় নদী। এই প্রথম, সজ্ঞানে, সচেতনে, চাঁদ আলিঙ্গন করে ফিরোজ দেওয়ানকে।

তারপর আলিঙ্গন ভেঙে বলে, তোমার স্থান রইল আমার মাথার উপরে। তুমি সেই স্থানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

থাকো। যেতে দাও আমাকে। আমি নিজে যাইবাম। আমারই কারণে তার এই পরিণাম। তার জন্যে মরি যদি তাতে নাই জগতের ক্ষতি। কী কব নিজের মুখে, সে আমার পতি।

একথা বাতাস বহন করে আজও মরা ব্রহ্মপুত্র জলে তোলে রোল। এ কথা শোনার পর ফিরোজ দেওয়ান দরোজার পাট খুলে পথ ছেড়ে নিমেষে দাঁড়ান।

বেগম মহলের বাইরে যাবার দরোজায় পা রাখতেই চুলে পড়ে টান।

ফিরোজের বুবু চিৎকার করে বলেন, যদি যাবি, চিরকালের মতো যাবি। কুলটা, অসতী নারী। পরপুরুষের জন্যে প্রাণ দিতে পারি?—এই তোর কথা? শোন্, এ মহলের বাইরে যে নারী চলে যায়, সে আর দেওয়ান বংশে স্থান নাহি পায়।

চাঁদ পা রাখে বেগম মহলের দরোজার বাইরে।

আর একটিবারের জন্যেও পেছন পানে তাকায় না সে। সূর্য তখন মাঝ আকাশে। তবু এত চোখ-ধাঁধানো আলোতেও এখন অন্ধকার এ জগৎ, এই অন্ধকার ভেঙে এলোচুলে এক পাগলিনী দৌড়ে যায় ব্রহ্মপুত্র জল অভিমুখে।

ফিরোজের দিকে তখন এই কালপ্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করেন বুবু, সে যদি আবার ফিরে আসে, আবার সে যদি এই দরোজায় পা দেয়, আমি তবে আত্মঘাতী হব।

পশ্চিমের দিকে ঢলে পড়ে আছে মনসুরের মুখ। নীলবর্ণ দেহ তার। কিন্তু প্রাণ এখনো রয়েছে। যেন সূর্য অস্ত যাবে, এক নারী পথ দিয়ে ঘরে ফিরে আসবে তাই পশ্চিমের রেখায় সূর্য এখনো বিলম্ব করছে।

'মনসুর, মনসুর' বলে ছুটে আসে চাঁদ। 'ক্ষতস্থান কোথায়' বলে সে চিৎকার করে জানতে চায়। ক্ষতস্থান নিজেই সে দেখতে পায়। যে হাত সারিন্দা বাজায়, সেই হাত, ডান সেই হাতের গোড়ায়, রক্তজমা দুটি বিন্দু। সেই বিষবিন্দু দুটিতে চাঁদ তার দুই ঠোঁট, লোকসকল, এখন স্থাপন করে, টানে বিষ। সবে করে ইস ইস। বিস্ফারিত চোখে হোমরা চেয়ে দ্যাখে। কন্যা টানে বিষ আর কালো রক্ত উগরায়, টানে আবার উগরায়।

ফিরোজের চোখে ব্রহ্মপুত্র ঢল। হাত বাড়িয়ে চাঁদকে বুকে নেবার বদলে, চাঁদের হাত মনসুরের হাতে সে তুলে দেয়।

কাল গরলের পরান বন্ধু, কাল গরলের জগৎ।

এখন এই বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদের কিনারে আছে শুধু এক নারী আর এক নর। আর আছে একখানা সারিন্দা আর অতীতের কত সেই সঙ্গীতের স্বর।

খলখল করে বয়ে চলে ব্রহ্মপুত্র জল। মনসুর তাকিয়ে থাকে চাঁদের দিকে অপলক চোখে। ঝুরঝুর করে পারিজাতের ফুল ঝরে পড়ে জগতে। কিন্তু মাটিতে সে ফুল পড়ে বৃশ্চিক হয়ে যায়।

উত্তাপ অতল জলের বুকে অকস্মাৎ মনসুর বয়াতি, সারিন্দাকে ছুড়ে দেয়। বলে—

'শোনো শোনো কন্যা, আমি কহি যে তোমারে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আইজ বিসর্জন দিলাম আমি আমার সারিন্দারে।
আর না করিব গান, তোমার কানে লো ডংশিয়া।
চায়া দ্যাখো ওই বুঝি যায় আমার যা ছিল ভাসিয়া।'
কেঁদে উঠে চাঁদ বলে—
'বিয়া হইছে লোকে জানে, কবুল পড়ি নাই,
আমারে যে চেতনহারা কইরাছিল ওষুধ খাওয়াই।
পতি বলি ডাকি নাইরে লোকের চক্ষে যিনি পতি।
তোমারেই সকল দিছি, তুমিই আমার গতি।'

'এমন কথা কইও না কন্যা, সমাজ মন্দ কবে।
নারীর কবুল বিয়ার কবুল জানিতে কে চায় কবে?
এ সংসারে নারীর অন্তর কেবান্ স্বীকার করে?
পুরুষ নাহি জানে কন্যা, আগুন ঘরে ঘরে।
নারীর সে আগুনে নারী নিজে পুইড়া ছাই।
আমার কী বা সাধ্য আছে জগৎ বদলাই?
আমি কবি, পারি শুধু রচিতে যে পদ আর বচন।
তাহাতে যদি বা হয় বিশ্বের চেতন।
নিজের জীবন দিয়া আমি ইতি করলাম পালা।
কঠিন এ জগতে আমি জুড়াইলাম জ্বালা।'

এত বলে মনসুর বয়াতি ঝাঁপ দেয় ব্রহ্মপুত্র জলে। লোকসকল, এই সেই ব্রহ্মপুত্র একদিন বরফের শিলারাশি হিমালয় হতে সরুলখা ধারা হয়ে নেমেছিল, মানুষের সবুজের দেশ তার খলখল জলোচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে ডুবিয়ে কালো পলিতে পলিতে ধান্য বীজের গর্ভ উর্বরা করে, তারপরে লক্ষ ঢেউ হাতে করতালি দিয়ে সাগরে ঝাঁপাতো। আজ তার খাত নাই, জল নাই, বীজের থলিও বন্ধ্যা, শুধু কালো কাদায় পায়ের চিহ্ন পথিকের ধরে।

বন্ধু, লয়া যাও, লয়া যাও—বলে চাঁদ সেই ব্রহ্মপুত্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে।

স্রোতের টানে ভেসে চলে কন্যার মুখ। আকাশের চাঁদ আজ ধরণীতে নেমে, জলে ভেসে যায়। জোয়ারের জলে ভাসে পদ্মফুল, আর তার পাশে পাশে ভাসে দুটি জন। আগে ভাসে সারিন্দা, তারপরে মনসুর বয়াতি, আর বয়াতির পরে ভাসে পূর্ণিমার লাশ। স্রোতের টানে ভাসে গান ও গায়ক, প্রেম ও বিচ্ছেদ, মৃত্যু ও মিলন ভাসে, ভেসে যায়, খরস্রোতে সকলই তো দরিয়ার দিকে ভেসে যায়।

আ, এই পানি যায়, পানি যায়, দূরে যায়, দরিয়ায়। ও কি পানি? রে পানি? ও কি কাহারো কমল চক্ষেরও পানি রে? পানি যায়, বহে যায়, দরিয়ায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম